কৌমুদী

দ্বিতীয় খণ্ড

৺মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, বি-এ

প্রণীত।

১৩৩৮ সন।

মূল্য ৸০ আনা, বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

ভূমিকা

গ্রন্থকার সুসঙ্গের মহারাজা শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ ১৬ই আশ্বিন ১৩২৩ সালে দেহত্যাগ করেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সুসঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের বিভিন্ন মাসিক পত্রে লিখিত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়া আমাকে তাহার ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিলেন, তখন আমি সে অনুরোধ পালন কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলাম।

অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গসাহিত্য যে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে তাহা আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই রস-সাহিত্য যাহাকে বলে, বাঙালীর প্রবণতা সেই দিকে। সাহিত্যের নানা দিক আছে। জ্ঞান রাজ্যের নূতন নূতন দিকের সন্ধান বলিয়া দিবে এমন গ্রন্থ বাংলায় কয়খানি রচিত হইয়াছে?

বাংলার প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির মধ্যে সুসঙ্গ রাজবংশ উচ্চ স্থান অধিকার করে। এই ব্রাহ্মণবংশে সাহিত্যের অনুশীলন নূতন নহে। গ্রন্থকার মহারাজের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রাজা রাজসিংহ ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। রাজসিংহ কিরূপ সুকবি ছিলেন কৌমুদীর প্রথম প্রবন্ধেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এইরূপ সংস্কৃতিসম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রন্থকার যে জ্ঞানালোচনায় অবহিত হইবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবে বিস্ময় বোধ করি অন্য এক কারণে। বড়লোকের কাছে সাহিত্য অবসর বিনোদনের উপায় মাত্র। কৌমুদী পড়িলেই বুঝা যাইবে মহারাজ-সুসঙ্গ সৌখীন সাহিত্যিক নহেন। কাব্য ও কাহিনীর রসেই তাঁহার হৃদয় তৃপ্ত নহে। তিনি সাহিত্যের অপরিচিত পথের পথিক।

'প্রাচীন ভারতে পশুচিকিৎসা' নিবন্ধটিতে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের একটি প্রায় অজ্ঞাতপূর্ব্ব অধ্যায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই দিকে যাঁহারা চেষ্টা করিবেন তাঁহারা বাংলার জ্ঞান ভাণ্ডারে অনেক নুতন তথ্য যোগাইতে পারিবেন। 'ভারতের গো-জাতির অবনতি' সম্পর্কে অনেক ভাবিবার কথা আছে। গো-কুলের রক্ষা ও উন্নতির উপর ভারতবর্ষের কল্যাণ যে বহুল পরিমাণে নির্ভর করে তাহা অবিসংবাদিত। এই অবনতি নিরোধের উপায় সম্বন্ধে মহারাজ যে চিন্তা করিয়াছেন বাংলার অন্যান্য ভূম্যধিকারী সেইরূপ চিন্তা করিলে আমাদের ভাবনার কারণ থাকিত না।

বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশে 'দুগ্ধ' সম্পর্কিত আলোচনাটি পরম মনোজ্ঞ হইয়াছে। একদিকে ইংরেজী বই আর একদিকে সংস্কৃত শাস্ত্র, অন্য দিকে নিজের অভিজ্ঞতা, এই তিনে মিলিয়া এই প্রবন্ধটিকে নানাবিধ তথ্যের আকর করিয়া তুলিয়াছে। 'দুগ্ধ' সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কথাই বলা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ হয়ত আধুনিক বিজ্ঞানের আরও অনেক কথা বলিতে পারিতেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও সংস্কৃত শাস্ত্রে নিহিত দুগ্ধ সংক্রান্ত পুরাকালীন তথ্য—আমাদের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। এ ইরূপ অপ্রচলিত শাস্ত্রে মহারাজের গভীর পাণ্ডিত্য বিস্ময়কর !

বইখানি শুধু কৌতুহলের উদ্দীপক নহে, ইহার ব্যবহারিক উপকারিতা কতটা পড়িলেই তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ সন
১৪ পার্শীবাগান, কলিকাতা

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

নিবেদন

"কৌমুদী" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল।

শ্রদ্ধেয় ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু এম্ বি, ডি এস্ সি, মহোদয় ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ায় আপ্যায়িত হইয়াছি। স্বর্গীয় পিতৃদেব ডা: বসু মহাশয়কে একাধারে বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন।

সৌরভ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

তৃতীয় খণ্ড ও শীঘ্রই প্রকাশিত করিবার বাসনা রহিল।

কৌমুদীর প্রবন্ধ প্রায় গুলিই "সাহিত্য সংহিতা" "আরতি" "বান্ধব", "সৌরভ" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকাংশ প্রবন্ধই বিংশতিবর্ষের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে প্রত্যেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার তারিখ সন্নিবেশিত হইবে।

১লা পৌষ, ১৩৩৮ সন
সুসঙ্গ

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।

সূচী

পশু পক্ষী পালকশ্রেষ্ঠ • স্বর্গীয় মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ।

(ইহাই তাঁহার শেষ ছবি। কুমার শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর কর্তৃক গৃহীত।)

ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি।

৺রাজা রাজসিংহ।

আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রাজা রাজসিংহ বাহাদুর একজন পরম ধার্ম্মিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। সুসঙ্গ রাজ্যে যে সকল ব্রহ্মত্র প্রভৃতি বিদ্যমান আছে তাহার অধিকাংশই তাঁহার কর্তৃক প্রদত্ত। তাঁহার দানশীলতায় উপকৃত হয় নাই, সুসঙ্গ রাজ্যে এমন প্রায় কেহই নাই; কেবল তাহাই নহে তিনি একজন সুকবিও ছিলেন, তাঁহার রচিত একখানা হস্ত-লিখিত কাব্য ও দুই তিন খানা খণ্ড কাব্য অদ্যাপি আমাদেব পুস্তকালয়ে বর্ত্তমান আছে। সুখের বিষয় এই যে, বিগত ১৩০৪ বঙ্গাব্দের প্রলয়ঙ্কর ভীষণ ভূকম্পনে আমাদের অনেক বহুমূল্য ধনপ্রাণ নষ্ট হইলেও কবির, বহু-আয়াস-রচিত কাব্যগুলি বিলুপ্ত হয়

নাই, কিন্তু সে গুলি লিপিকর-প্রমাদে এত দূষিত যে এক-প্রকার অপাঠ্য বলিলেও হয়। কবির রচিত "রাজ-মালা" ও "মনসা-পাঁচালী" নামক খণ্ড-কাব্যদ্বয় আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের যত্নে মুদ্রিত হইয়া, জন-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অধুনা আমি "ভারতীমঙ্গল" কাব্যখানা প্রচারিত করিতে ইচ্ছা করিয়া বহু চেষ্টাতে পাঠোদ্ধার করিয়াছি। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি রক্ষা দ্বারা পুণ্যলাভ এবং কর্ত্তব্যপালন এই উভয় কার্য্যই সম্পন্ন হয়, এতদভিপ্রায়েই গ্রন্থ-প্রচারের ইচ্ছা, যশ অথবা ধন-লাভের আশায় নহে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল "ভারতী মঙ্গল" সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। "ভারতীমঙ্গল" কালিদাসের সরস্বতী কুণ্ডে স্নানান্তে ভারতীদেবীর বরলাভ বিষয়ক প্রচলিত প্রস্তাব অবলম্বনে রচিত। যদিও এই কাব্যে কবির চরিত্রাঙ্কনা-প্রতিভা ততদূর পরিস্ফুট হয় নাই, তথাপি রচনা-মাধুর্য্যে, রস-বৈচিত্রে এবং ভাষার পারি-পাট্যে ইহা বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে কেবল নগণ্য স্থান অধিকার করিবে, এমন বোধ হয় না। কবির ভাষা যে প্রকার সংস্কৃত আভিধানিক শব্দে পরিপূর্ণ, তাহাতে অনুমান হয় তিনি একজন সংস্কৃত-ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় এই যে,—মিথিলা-নগরীতে শত্রুজিত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা হয়। পুত্রদ্বয় ও রাজকন্যা যথাশাস্ত্র সুশিক্ষালাভ করিলেন, অতঃপর

কন্যাটী বাল্যাবসানে যৌবনে পদার্পণ করিলেন; কবির ভাষায় বলিতে গেলে,—

"বাল্যাবস্থা হৈল শেষ, যৌবনেতে পরবেশ,
ভূপাত্মজা বাড়ে দিনে দিনে।
দেখি তার মুখছন্দ, চকোরদ্বিরেফে দ্বন্দ,
সোম পদ্ম-ভ্রম ভাবি মনে॥"

তখন কন্যাকে রাজা—"সমর্পিব তারে যেবা জিনিবে বিচারে" এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। কন্যালাভার্থী বহুপণ্ডিত বিচারে পরাভূত হইয়া লজ্জিত হইলে, তাঁহারা কালিদাস নামক এক মূর্খ ব্রাহ্মণকে পণ্ডিত কল্পনা করিয়া সকলে তাঁহার শিষ্যরূপে কন্যার সহিত বিচারে উপস্থিত হইলেন, তখন কালিদাস,—

"মধ্যে অধ্যাপক আছে পরম-কৌতুকে।
মস্তক ঢুলায় মাত্র বাক্য নাই মুখে॥"

এই ভাবে রহিলেন,—বিচারের ফল হইল যে,—

"না পায় পণ্ডিতে যাকে বিস্তর পড়িয়া।
কালিদাস লভে তাকে মস্তক ঢুলায়া॥"

কন্যা-লাভান্তে কালিদাস স্বকীয় জ্ঞানগরিমা প্রকাশিত হওয়ার আশঙ্কায়, মৌনাবলম্বনই কর্ত্তব্য মনে করিলেন,—কিন্তু দৈবাৎ অসাবধানতা বশতঃ একদিন তাঁহার মুখে অত্যন্ত প্রাকৃত-ভাষা ব্যক্ত হইয়া পড়িল; ইহাতে রাজকুমারী তাঁহাকে যৎ-পরোনাস্তি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিলেন। অত্রাবস্থায় কালিদাস

নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া নৈমিষারণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর শনকমুনি তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, সরস্বতী-সলিলে অবগাহন করিতে উপদেশ দিয়া, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের বিবরণ শ্রবণ করাইলেন; এতদুপলক্ষে কবি, উক্ত পুরাণের কাহিনী সংক্ষেপে এবং স্থকৌশলে ভারতীমঙ্গল কাব্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অতঃপর কালিদাসের অনুরোধে শনক মুনি, সরস্বতীদেবীর উৎপত্তি, দেবগণকর্ত্তৃক তাঁহার অর্চ্চনা এবং মুনিগণ কর্ত্তৃক জগতে দেবীর পূজা প্রচারের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। তদনন্তর শনকমুনি কালিদাসকে কিছুকাল সংযমী অবস্থায় রাখিয়া, সরস্বতীমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। অভীষ্ট-মন্ত্র লাভ করিয়া কালিদাস,—

"শরৎ-শশাঙ্ক-সম নির্ম্মল-শরীর।
চপলতা খণ্ডি দ্বিজ হইল সুস্থির॥"

অতঃপর কালিদাস মুনির উপদেশানুযায়ী,—

"জপে দিবা রাতি, ভাবিয়া ভারতী,
মনে নাহি কিছু আর।
শিশির-সময় যথা বারিচয়,
তাহে তনু মজাইয়া।
সকল যামিনী, দ্বিজ জপে বাণী
অত্যন্ত আরদ্র হ'য়া॥

কঠোর তপস্যান্তে ভারতীদেবী কালিদাসের সমক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূতা হইয়া বর প্রদান করিলেন; তখন কলিদাসের :—

সর্ব্বশাস্ত্র অধিষ্ঠান কণ্ঠে কৈল আসি।
রাহু-গ্রাস হৈতে যেন মুক্ত হৈলা শশী॥
কৃষাণু মূর্চ্ছিত যেন থাকে ভস্ম মেলে।
ইন্ধন-সংযোগ হৈলে প্রজ্জ্বলিতে জ্বলে॥

কিন্তু ভ্রান্তি বিমূঢ়-চিত্তে কালিদাস সর্ব্বাদৌ বাগ্‌বাণীর রূপ-বর্ণনা আরম্ভ করিলে, দেবী কুপিতা হইয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত করিলেন। ইহাতে তিনি প্রখ্যাতনামা রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ হইয়া, অখণ্ডনীয় শাপ-প্রভাবে বারবণিতা-গৃহে নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। জগদ্বিখ্যাত কবিকুল-চূড়ামণি মহাকবি কালি-দাসের এই শোচনীয় পরিণাম পরিতাপের বিষয় বটে। এই প্রবাদ বাক্য কতদূর সত্য, আমি তাহা বলিতে পারি না।

কবির জন্মকাল ও গ্রন্থরচনার সময় নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়া, এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। দুর্ভাগ্যের বিষয় "ভারতীমঙ্গল কাব্যে" রচনার সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; গ্রন্থপাঠে বোধ হয়, কবির অগ্রজ ৺রাজকিশোর সিংহের জীবিত-কালেই ইহা রচিত হইয়াছিল; প্রায় প্রত্যেক কবিতার শেষভাগে কবি অগ্রজের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সৌভ্রাত্র আদর্শস্থানীয় ছিল। রাজা কিশোর সিংহ ৩৬ বৎসর মাত্র বয়সে ১১৯২ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন,

অতএব তাহার জন্মকাল ১১৫৬ সন; কবি তাহা হইতে প্রায় দুই বৎসরের কনিষ্ঠ, ইহাতে তাঁহার জন্মকাল ১১৫৭।৫৮ বঙ্গাব্দ হইতেছে, রাজা রাজসিংহ প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে ১২২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে স্বর্গারোহণ করেন; ইহাতে অনুমিত হয় যে, কবি ৩০।৩২ বৎসর বয়সে "ভারতীমঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন; অতএব গ্রন্থখানা প্রায় ১২০।১২২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, একথা নিশ্চিত।

আমাদের বংশে দত্তক পুত্রগ্রহণের পদ্ধতি বর্ত্তমান নাই। রাজা কিশোর সিংহ অপুত্রক ছিলেন, তিনি মৃত্যুকালে তাঁহার অনুজ রাজা রাজসিংহকে সুসঙ্গ রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া যান; ইহার সহিতই ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত করেন। আমাদের বংশে ইতিপূর্ব্বে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকারী হইতেন; অধুনা বহুকারণাধীনে সম্পত্তি, দায়ভাগানুসারে বিভাজ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, অতএব জ্যেষ্ঠাধিকারিত্বের নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গাধীনে আমি মূল বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন প্রকৃতানুসরণ করা যাউক।

কবির জন্মকাল যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক লোক বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। যাহা হউক, এত প্রাচীনকালেও কবি যে এত মার্জ্জিত বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইহাই

আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা আশা করি, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যামোদী সুধীগণ "ভারতী মঙ্গল" পাঠে অপরিসীম আনন্দানুভব করিবেন এবং কবির শ্রমও সফল হইবে এবং তাহার বংশধর বলিয়া আমরাও কথঞ্চিৎ গৌরবান্বিত হইব।

অতঃপর রাজা রাজসিংহ হইতে আমাদের বংশাবলী নিম্নে প্রদান করিয়া, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

বংশ প্রবর্ত্তক ৺সোমেশ্বর পাঠক (ইনি কান্যকুব্জ হইতে পরিব্রাজকবেশে বঙ্গদেশে আসিয়া সুসঙ্গে রাজ্য স্থাপিত করেন, ইহার বিস্তৃত বিবরণ সুসঙ্গের ইতিহাসে বিবৃত করার ইচ্ছা আছে।

রাজা রাজসিংহ (সোমেশ্বর পাঠক হইতে দ্বাদশ পুরুষ)

(১) বৈত্তনাথ সিংহ শর্ম্মা। (পিতা বর্ত্তমানে অপুত্রক মৃত)
(২) রাজা বিশ্বনাথ সিংহ শর্ম্মা।
(৩) রাজা গোপীনাথ সিংহ শর্ম্মা।
(৪) রাজা জগন্নাথ সিংহ শর্ম্মা। ইনিও একজন সুকবি। ইনি জগদ্ধাত্রী গীতাবলী-নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন।
(৫) কৃষ্ণনাথ সিংহ শর্ম্মা। (অপুত্রক মৃত)

(২) রাজা বিশ্বনাথ সিংহ শর্ম্মা হইতে:

৺রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর।

(১) মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর।
(২) রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা।
(৩) রাজা জগৎকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা।
(৪) রাজা শিবকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা।

(১) মহারাজ রাজকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর হইতে:

[১] মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
[২] রাজা নীরদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
[৩] রাজা নগেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
[৪] রাজা দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
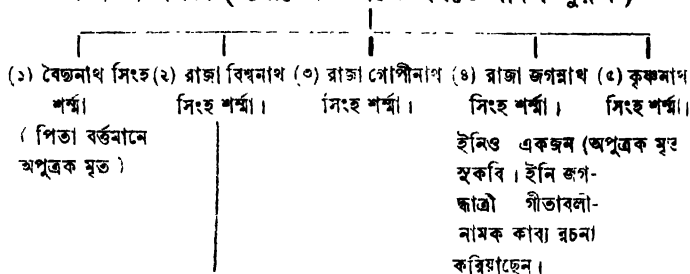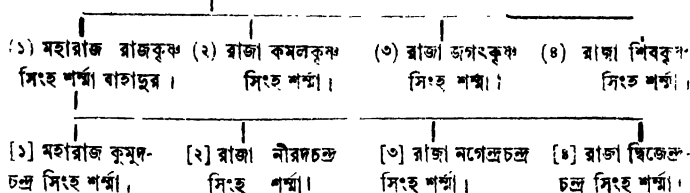
প্রাচীন ভারতে পশু-চিকিৎসা।

প্রাচীন ভারতে পশু-চিকিৎসা বিষয়ে কীদৃশ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা আলোচনার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অস্মদ্দেশীয় অনেকেরই বোধ হয় এই বিশ্বাস যে প্রাচীন ভারতের ঋষি সম্প্রদায় মানবের ব্যাধি উপশমনার্থ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের কতক প্রচার করিয়া থাকিলেও গৃহপালিত পশুদিগের চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনায় এবং তৎসংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এই ধারণা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহাই আমরা যথাসাধ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। উক্ত মহাত্মারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ ধ্যাননিমীলিত নেত্রে কেবল মাত্র পারলৌকিক ও অধ্যাত্ম বিষয়ের আলোচনাতেই কালাতিপাত করত ইহলৌকিক সর্ব্ববিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ঐহিক উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই উক্তি কতদূর বিচারসহ তাহারও আলোচনা প্রয়োজন।

আর্য্য-ঋষিগণ ব্রহ্মবিদ্যাকেই পরা (শ্রেষ্ঠ) বিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহারা বলিয়াছেন যে "পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"; এবং তদ্‌ব্যতিরিক্ত সর্ব্ববিধ লৌকিক শাস্ত্রকে তাঁহারা "অপরাবিদ্যা" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। পরন্তু যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধায়ী তাঁহারা ও অবগত আছেন যে, লোকহিতৈষণাপ্রনোদিত প্রাচীন ভারতীয় ঋষিসঙ্ঘ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গসাধনোপযোগী বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করতঃ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনে যত্ন ও পরিশ্রমের ক্রুটি করিয়া যান নাই। অবশ্য আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই নানা বিপ্লবে কালের করাল কুক্ষিগত হইয়াছে; তথাপি যাহা অদ্যাপি অবশিষ্ট আছে, তদ্দ্বারাই বিলক্ষণরূপে প্রতীতি জন্মে যে, পরমকারুণিক ঋষিগণ একদিকে অধ্যাত্ম বিষয়ে চিন্তারত থাকিয়াও অপরদিকে লোক হিতকর নানা বিদ্যালোচনায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁহারা যেমন ষড়ঙ্গবেদ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং ছন্দঃ এই ছয়-বেদের অঙ্গ,) উপনিষদ্ প্রভৃতির আলোচনার দ্বারা অধ্যাত্ম জ্ঞানের উন্নতির উচ্চ-সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ষড়-দর্শন আলোচনাতে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি এবং তীক্ষ্ণ মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে লোক হিতকর আয়ুর্ব্বেদ (মনুষ্যায়ুর্ব্বেদ, পশ্বায়ুর্ব্বেদ, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ), গণিত (বীজ, পাটি, জ্যামিতি, ত্রিকোন-মিতি, পরিমিতি, খগোল প্রভৃতি), গন্ধর্ব্ববেদ (সঙ্গীত শাস্ত্র),

ধনুর্ব্বেদ, শিল্প-শাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, কাব্য, অলঙ্কার, নাটক, কথা, ঐন্দ্রজালিকবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিদ্যার আলোচনা দ্বারা ঐহিক উন্নতির পথ ও উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। চতুঃষষ্টি-কলা-বিদ্যা (আমরা এগুলিকে fine arts বলিতে পারি) প্রাচীন ভারতে রীতিমত আলোচিত হইত। বাৎস্যায়ন-প্রণীত কামসূত্র গ্রন্থের সাধারণাধিকরণের তৃতীয় অধ্যায় পাঠে কলা বিদ্যার প্রত্যেকটীর সংজ্ঞা অবগত হওয়া যায়, এবং যশোদর কৃত উক্ত গ্রন্থের টীকায় চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যার ব্যাখ্যাও দেওয়া আছে। এই সমস্ত নির্বিষ্টান্তঃকরণে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে প্রাচীন ভারত এক সময়ে, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ত কথাই নাই, পরন্তু ঐহিক শাস্ত্রাদির আলোচনাতে ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে ইয়ুরোপীয় সভ্যতাভিমানী বুধবৃন্দ প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-গভীরতার অবিসংবাদিত পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। ভারতের নানাস্থানে প্রাচীন মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া ভারতীয় স্থপতি-বিদ্যার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমাদের অভিপ্রেত নহে; অতএব এসম্বন্ধে আর অধিক না বলিয়া প্রাচীন ভারতের পশুচিকিৎসা বিষয়ক শাস্ত্রালোচনাতেই প্রবৃত্ত হইতেছি, কারণ ইহাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ :— (১) শল্যতন্ত্র, (২) শালক্যতন্ত্র,

(৩) কায়চিকিৎসা, (৪) কৌমারভৃত্য, (৫) অগদতন্ত্র, (৬) ভূতবিদ্যা, (৭) রসায়নতন্ত্র, (৮) বাজীকরণ তন্ত্র,। আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গ প্রচারদ্বারা যেমন মানবের আগন্তুক, দোষ সমুত্থ এবং কর্ম্মজ, এই ত্রিবিধ ব্যাধির উপশমনার্থ ঋষিগণ নানাপ্রকার ভেষজ আবিষ্কার করত মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ পশ্বায়ুর্ব্বেদ, (অশ্বায়ুর্ব্বেদ, গজায়ুর্ব্বেদ, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির) প্রচারদ্বারাও মানবের নিত্য প্রয়োজনীয় গবাশ্বাদির রক্ষা ও ব্যাধি প্রশমনের উপায় চিন্তা করিতেও বিরত ছিলেন না। কেবল ইহাই নহে; তাঁহারা বৃক্ষদিগকেও [উদ্‌ভিজ্জ মাত্রকেই] জীব-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতঃ তাহাদের ব্যাধি-প্রতিকার জন্য "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ" প্রচার করিয়া বুদ্ধিমত্তার ও অনুসন্ধিৎসার একশেষ নিদর্শন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে প্রাণিগণ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে; যথা—

(১) জরায়ুজ (মনুষ্য, বানর প্রভৃতি অন্যান্য চতুষ্পাদ স্তন্যপায়ীজীব)

(২) অণ্ডজ (পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, সরীসৃপাদি)।

(৩) স্বেদজ (মশকদংশ, উৎকুণাদি)

(৪) উদ্‌ভিদ্ (বৃক্ষ, লতা, তৃণ গুল্মাদি]।

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি মনু গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন যে, বৃক্ষাদিরও প্রাণ আছে ও তাহারা ও সুখ দুঃখানুভব করে। "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ" অর্থাৎ বৃক্ষাদির ও

অন্তঃসত্তা আছে, এবং ইহারাও অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় সুখদুঃখানুভব করিয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রে বৃক্ষাদির শ্রাদ্ধ ও তর্পনের বিধান আছে। অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে, জগৎবিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অধুনা আবার প্রাচীন ঋষি বাক্যেরই যথার্থ্য তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্র সাহায্যে প্রমাণিত করতঃ পাশ্চাত্য জগৎকেও চমৎকৃত করিয়াছেন। একথাগুলি, অপ্রাসাঙ্গিক হইলেও বলিতে বাধ্য হইলাম। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি" "কেদারকল্প" "কৃষিপরাশর" প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে অনেক কথা জানা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ আলোচ্য বিষয় নহে, অতএব তাহা পরিত্যক্ত হইল। এতাবতা পাঠকবর্গ বোধ হয় বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে, ভারতীয় ঋষিগণ লোক-হিতকর কোনও বিষয়ের আলোচনাতেই উদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই; তাঁহারা যে কেবলই যোগী ছিলেন তাহা নহে, অপিচ পার্থিব উন্নতির চিন্তায় ও রত ছিলেন, একথায় বোধ হয়, কোনও আপত্তি হইবে না, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত মহাত্মাগণের উক্তি যে বিচারসহ নহে, তাহাও বোধ হয় প্রতিপন্ন হইল।

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় আমরা প্রকৃত প্রস্তাব হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, অধুনা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।—সংস্কৃত কাব্যাদির টীকা এবং পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" ও "অশ্বায়ুর্ব্বেদ"

সম্বন্ধে পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রাচীন ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রমাণ স্বরূপ আমরা অগ্নি পুরাণের ২৭৬ অধ্যায়ের একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি সেইটি এই যথা—

পালকাপ্যোহঙ্গরাজায় গজায়ুর্ব্বেদমব্রবীৎ।
শালিহোত্রঃ সুশ্রুতায় হয়ায়ুর্ব্বেদমুক্তবান্ ॥

এতদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, "পালকাপ্য" অঙ্গাধিপতির নিকট "গজায়ুর্ব্বেদ" এবং মহর্ষি "শালিহোত্র" "সুশ্রুতের" নিকট "অশ্বায়ুর্ব্বেদ" বলিয়াছিলেন; অতএব "পালকাপ্য" এবং "শালিহোত্র" এই দুই মহাত্মা যে গজায়ুর্ব্বেদ ও অশ্বায়ুর্ব্বেদের আদি প্রচারক তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। রামায়ণ পাঠে আমরা অবগত হই যে, অঙ্গাধিপতি রাজা "লোমপাদ" অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পরম আত্মীয় ও সুহৃদছিলেন। মহারাজ দশরথ এই রাজার নিকট স্বীয় দুহিতা শান্তাকে "দমিত্রা" কন্যা স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন এবং বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তা পরিণীতা হইয়াছিলেন। মহারাজ দশরথ চতুর্ব্বিংশ ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে মৎস্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে

"চতুর্ব্বিংশে যুগে রামো বশিষ্ঠেন পুরোধসা।
সপ্তমো রাবণস্যার্থে জজ্ঞে দশরথাত্মজঃ ॥"

অতএব মহর্ষি পালকাপ্য যে দশরথের সমসাময়িক লোক, তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, কেননা রাজা লোমপাদ (অঙ্গাধিপতি) সন্নিধানেই মহর্ষি পালকাপ্য

হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ বলিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা পালকাপ্য-প্রণীত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারিত হইতেছে। ঐতিহাসিক আলোচনা আমাদের অভিপ্রেত নহে, কেবল মাত্র গজায়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ জন্যই প্রসঙ্গাধীন ২। ৪টী কথা বলা হইল। পালকাপ্য প্রণীত হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ। ইহা—

(১) "মহারোগস্থান" [২] "ক্ষুদ্র রোগ স্থান," [৩] শল্যস্থান এবং [৪] "উত্তর স্থান" এই চারিটি ভাগে বিভক্ত। "মহারোগ স্থানে" ১৮টী, "ক্ষুদ্র রোগস্থানে" ৭২টী, "শল্যস্থানে" ৩৪টী, এবং 'উত্তর স্থানে" ৩৬টী অধ্যায় আছে; অর্থাৎ সমগ্র গ্রন্থ ১৬০টী অধ্যায় যুক্ত। অন্যান্য আয়ুর্ব্বেদ সংহিতার ন্যায় হস্ত্যায়ুর্ব্বেদের ভাষা ও গদ্যপদ্যময়, এবং ইহাতে দুই সহস্রাধিক শ্লোক নিবদ্ধ আছে। গ্রন্থে হস্তীর ৩১৫ প্রকার বিভিন্ন ব্যাধির নিদান ও চিকিৎসাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা আর্ষ গম্ভীর, প্রাঞ্জল এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট, ইহাও এই গ্রন্থের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ। "শল্যস্থানের" ত্রিংশাধ্যায়ে হস্তীর অস্ত্রচিকিৎসা সাধনার্থ যে সমস্ত যন্ত্রাদির বর্ণনা আছে, তাহা প্রায় সুশ্রুত-সংহিতা-বর্ণিত যন্ত্রাদিরই অনুরূপ, হস্তীর অবয়ব প্রভৃতির পার্থক্যানুরূপ যাহা কিছু বিভিন্নতা আছে। ইহা হওয়াই স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত। ফলতঃ এই অধ্যায়টী অতি বিস্ময়জনক। অস্ত্র-কর্ম্ম ৭ প্রকার কথিত হইয়াছে, যথা—

(২) ছেদ্য (Incision), (২) ভেদ্য (Puncturing),

(৩) লেখ্য (Scratching), (৪) বিস্রাবনীয় (Evacuating fluids), (৫) বিদারণীয় (বোধ হয় Boring), (৬) এষ্য (Probing), এবং সিবনীয় (Sewing)। সুশ্রুত সংহিতায় এতদতিরিক্ত আহার্য্য (Extracting) নামক একটী অধিক ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। অনাবশ্যক হইলেও পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এবং মহর্ষির ভাষার ও লিখন-ভঙ্গির যৎসামান্য আভাষ দেওয়ার উদ্দেশ্যে "শল্যস্থানে"র ত্রিংশৎ অধ্যায়টী প্রায় সমগ্র ভাবেই এইস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

"অথোবাচ ভগবান্ পালকাপ্যঃ—ইহ খলু ভো হস্তিনামাগন্তবো দোষসমুত্থাশ্চ ব্রণাবিধয়ো বহুবিধা ভবন্তি। তেষাং দোষপ্রশমনার্থং শাস্ত্রবিধানং সংস্থানপ্রমাণতশ্চ বক্ষ্যামি।

তত্র কুণ্ঠং খরধারং বক্রং হ্রস্বমনতিস্থূলং (অতিস্থূলমিতি পাঠান্তরম্) দীর্ঘমানতং খণ্ডং বর্জয়েৎ গুণবদ্বিপরীতং ন চাতিনিশিতং শস্ত্রমবচারয়েৎ।

অত্র তীক্ষ্ণায়সা বিধিবন্নিষ্পন্নেন কুশল কর্ম্মারঃ শস্ত্রানি কুর্য্যাৎ। তদুত্তমেন দ্রব্যেণোত্তমেন ক্রিয়য়া চোত্তময়া কৃতং শস্ত্রং কার্য্যং সাধয়েদিতি। তস্মাৎ প্রযত্নঃ কার্য্যঃ শস্ত্রানামুত্তমানাং করণে।

তত্র শাস্ত্রাণি দশনামসংস্থানানি ভবন্তি তদ্ যথা—

বৃদ্ধিপত্রম্, কুশপত্রম্ঃ ব্রীহিমুখম, মণ্ডলাগ্রম, কুঠারাকৃতি, বৎসদন্তম্, উৎপলপত্রম্, শালাকা, সূচী, দম্ভাকশ্চেতি। কালঙ্কাম্বক-

তাপিকা (জাম্ববৌষ্ঠতা ইতি পাঠান্তরম্) দর্ব্যাকৃতয়শ্চেতি। এতান্যপি কর্ম্মবিধানে চত্বারি চান্যাণি শল্যোদ্ধরণানি ! যথাযোগং সিংহদষ্ট্রং ; গোধামুখং, কঙ্কমুখং, কুলিশমুখঞ্চেতি তিস্রএষিণ্যঃ। একবিংশতিরেব বাহয়োময়াণি সাধনানি ভবন্তি। তেষাং সংস্থানং প্রমণাং কর্ম্মাণি বক্ষ্যামঃ— তত্র দশাঙ্গুলপ্রমাণং বৃদ্ধিপত্রম্। ষড়ঙ্গুলপ্রমাণং বৃত্তম্। চতুরঙ্গুলপ্রমাণং পত্রম্। ত্র্যঙ্গুলবিস্তীর্ণং পাটনার্থং ছেদনার্থঞ্চেতি ষড়ঙ্গুলকতমূর্দ্ধাঙ্গুলং সর্ব্বতঃ। তৎপূর্ণচন্দ্রাকৃতিরগ্রে মণ্ডলাগ্রম্। লেখনার্থমঙ্কো ব্রীহিমুখম্। উৎপলপত্রমষ্টাঙ্গুলমেষ্টকম্। তচ্চাষ্টাঙ্গুলপ্রমাণম্। মধ্যমাঙ্গুলবিস্তৃত মুভয়তোধারম (ব্রীহিমুখাকৃতি ব্রীহি মুখমুঞ্জভেদনার্থং ছেদনভেদনার্থঞ্চেতি। নবাঙ্গুলং কুশপত্রম। পঞ্চাঙ্গুলং বৃত্তম্। মধ্যাঙ্গুলং পত্রং মধ্যাঙ্গুলবিস্তৃত মুভেয়তোধারম্। ইতি ধন্মুশ্চিহ্নান্তর্গতঃ পাঠঃ ক্বচিৎ হস্তলিখিত গ্রন্থে ন দৃশ্যতে কুশপত্রাকৃতি গম্ভীরপাকভেদনার্থং ষড়ঙ্গুলবৃত্তম্। অধার্দ্ধাঙ্গুলপত্রম্। পূর্ণচন্দ্রা কৃত্যগ্রে মণ্ডলাগ্রম্। লেখনার্থমঙ্কো ব্রীহিমুখমুৎপলপত্রং ভেদনার্থং। কুঠারাকৃতিকুর্য্যাৎ কুঠারশস্ত্রং প্রচ্ছেদনার্থং।

বৎসদন্তাকৃতি বৎসদন্তং দৃশাঙ্গুলম্ একৈক মধ্যার্দ্ধাঙ্গুলমুখম্। এবমেতানিচ ত্রীণ্যাপি যথাযোগ্যং প্রচ্ছনার্থং, সূচী সেবনার্থম্। অষ্টাঙ্গুলং নাগদন্তাকৃতি ত্র্যস্রা, চতুরস্রা বা দৃঢ়া সমাহিতা সমা বা শলাকা বনে বত্ম বিধৃত্যর্থম। রম্পকস্ত্র্যঙ্গুলমুখোদশাঙ্গুলবৃত্তঃ পাদশোধনার্থং নখচ্ছেনার্থঞ্চেতি। এষনী দশাঙ্গুলা, বিংশত্যঙ্গুলা ত্রিংশাঙ্গুল, যথাযোগমঞ্জন শলাকাকৃতি মুখতঃ শঙ্কাসমা

চৈবমেতা স্তিস্রে এষণ্যঃ প্রমাণতঃ কার্য্যাঃ। কোরণ্ট পুষ্পাকৃতিমুখনেত্রে তাম্রায়সং ষোড়শাঙ্গুল মনুপূর্ব্বং ব্রাণানাং প্রক্ষালনং কুর্য্যাদ্বড়িশং চক্রাগ্রমষ্টাঙ্গুল প্রমাণমঙ্কোঃ পটলোদ্ধরনার্থঞ্চেতি। তত্র শ্লোকঃ—

যথোক্তাণ্যেবমেতানি শস্ত্রানি বিধিবদ্ভিষক্ঃ—
কারয়িত্বা যথাযোগং কুর্য্যাদ্ব্রণ বিদারণম্।

ইতি শ্রীপালকাপ্যে হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ-মহাপ্রবচণে তৃতীয়ে শল্যস্থানে ত্রিংশঃ শস্ত্রাবিধিরধ্যায়ঃ॥

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক অস্ত্রসাধ্য রোগচিকিৎসার বর্ণনকালে তত্তৎস্থলে কীদৃশ অস্ত্র কি প্রকারে প্রয়োগ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে বিশদ উপদেশ সন্নিবেশিত আছে। বাহুল্য ভয়ে সেগুলির দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল না। হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে হস্তার শরীর স্থান (Anatomy and Physiology প্রভৃতি বিষয়), মূঢ়গর্ভাবিদারণ, দন্তোৎপাটন, অস্ত্রচিকিৎসার্থ হস্তীকে নানাপ্রকার বন্ধন, কবল (poultice) স্বেদকর্ম্ম, বস্তিকর্ম্ম (application of syringe and enimal etc.), অগ্নিকর্ম্মবিধান, ক্ষারকর্ম্ম (alkaline treatments), নস্য, ধূপ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। হস্তিশালা নির্ম্মাণ, হস্তিপালন, হস্তিশিক্ষা এবং শাস্ত্রাধ্যয়ণের প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে ও এই গ্রন্থে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে হস্তি সম্বন্ধে এমন কোন ও জ্ঞাতব্য বিষয় নাই যাহা হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থখানি মনোনিবেশ সহকারে

অধ্যয়ন করিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, এবং স্মরণাতীত কালপূর্ব্বে যে মহর্ষি পালকাপ্য কতদূর অনুসন্ধিৎসা জ্ঞানগভীরতা এবং সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। এই গ্রন্থখানি ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে ৪ খানি হস্তালিখিত পুস্তকাবলম্বনে পাঠান্তরাদি সহ শ্রীযুক্ত মহাদেব চিমনাজী আপ্তে মহোদয় পুণা আনন্দ আশ্রম হইতে প্রকাশিত করত লোক সমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। প্রচারক মহাশয় ইঁহাতে ভারতবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গ্রন্থে কোন ও টীকা সংযোজিত না থাকায় এবং হস্তলিখিত আদর্শ পুস্তকগুলি স্থানে স্থানে খণ্ডিত থাকা নিবন্ধন কতক শ্লোক অসম্পূর্ণ ভাবে মুদ্রিত হওয়ায়, গ্রন্থের বোধ সৌকর্য্যের কথঞ্চিৎ অন্তরায় ঘটিয়াছে। ইহা প্রকাশক মহাশয়ের দোষ নহে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুশীলনকারী সুধীবর্গ এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ও ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিলে, হস্তিপালনকারী ব্যক্তিবর্গের বিশেষ উপকার হয়।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে রাজন্য ও ভূম্যধিকারীগণ হস্তী প্রতিপালন করিয়া থাকেন, অতএব তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুবাদে হস্তক্ষেপ করার পূর্ব্বে গ্রন্থোক্ত পারিভাষিক শব্দগুলির এবং ভেষজাদির অর্থ পরিগ্রহ করা উচিত, নতুবা অনুবাদ ভ্রম-শঙ্কুল হইবে এবং উহাতে ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টাশঙ্কাই অধিক হইবে। সম্প্রতি ত্রিবেন্দ্রম

(মান্দ্রাজে) "মাতঙ্গলীলা" নামক একখানি হস্তিবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। হস্তি চিকিৎসা বিষয়ক "করি কৌতুকসার", "মাতঙ্গদর্পণ", হস্তিবিলাস", "গজেন্দ্র চিন্তামণি" প্রভৃতি আরও কতিপয় অর্ব্বাচীন গ্রন্থের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলি অমুদ্রিতাবস্থায়ই আছে বলিয়া বোধ হয়। ইতঃপর "বারাহী সংহিতা", "গর্গ সংহিতা", "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি", বসন্তরাজ", "বাজবল্লভ", "জ্যোতির্নিবন্ধ", "ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ", "অগ্নিপুরাণ", "গরুর পুরাণ" প্রভৃতি গ্রন্থে হস্তি-চিকিৎসা সম্বন্ধে কতক কতক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এখন বোধ হয় দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি যে প্রাচীন ভারতে হস্তিচিকিৎসা বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং এতৎসংক্রান্ত বহুগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। কালবশে অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হওয়ায় কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। পাশ্চাত্য দেশে হস্তী জন্মে না, এতন্নিবন্ধন পাশ্চাত্য ভাষায় হস্তি-চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নাই। ভারতবাসী কোনও কোনও লোকেরা এবিষয়ে সম্প্রতি ২।১খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে Gilchrist & Major Evans প্রণীত গ্রন্থদ্বয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থগুলিতে প্রায়ই দেশীয় ভেষজ ব্যবহারেরই ব্যবস্থা দেখা যায়। আরব্য ও পারস্য ভাষায় হস্তী বিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থ আছে, এই প্রকার জানা যায়। এগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের অনুকরণে লিখিত কি না উক্ত ভাষাদ্বয়ের

কোন ভাষায় আমাদের অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহা বলিতে অক্ষম। আরব্য ও পারস্য ভাষাভিজ্ঞ কোনও মহাত্মা এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়ার সুবিধা হয়।

সম্প্রতি আমরা প্রাচীন ভারতে অশ্ব চিকিৎসা বিষয়ে ২।৪টী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অগ্নি পুরাণের বচনানুসারে জানা যায় যে "শালিহোত্র" সুশ্রুতের নিকট হয়ায়ুর্ব্বেদ বলিয়াছিলেন, অতএব শালিহোত্র ঋষি যে অশ্বচিকিৎসা গ্রন্থের আদি প্রচারক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সুশ্রুত এবং প্রসিদ্ধ শারীর শাস্ত্রবিৎ সুশ্রুত সংহিতাকার "মহর্ষি সুশ্রুত" অভিন্ন ব্যক্তি কিনা তাহা বলা দুরূহ। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে দুইজন একনাম ধারী বিভিন্ন ব্যক্তি। পূর্ব্বকালে গ্রন্থকারের নামানুসারেই গ্রন্থের নামকরণ হইত। আয়ুর্ব্বেদ প্রচারক অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, ক্ষারপাণি, পরাশর, হারীত প্রভৃতি ঋষি প্রণীত গ্রন্থগুলি স্বীয় স্বীয় নামানুযায়ী সংহিতা বলিয়াই প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবেশ তন্ত্রই উত্তরকালে মহর্ষি চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত হইয়া ও "চরকসংহিতা নামে লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। তদ্রূপ শালিহোত্র প্রণীত অশ্বশাস্ত্র ও "শালিহোত্র সংহিতা" নামে বিখ্যাত। এই গ্রন্থ অদ্যাপি পূর্ণাবয়বে প্রকাশিত হয় নাই। ক্বচিৎ ২।১টী অধ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র। শুনা যায় এই গ্রন্থও বিশাল এবং অশ্বচিকিৎসা সম্বন্ধে অতি বিশদ ও প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা সমগ্র ভাবে মুদ্রিত হইলে

এসম্বন্ধে আলোচনা করার অবকাশ হইবে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে Bengal Asiatic Society হইতে ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় চতুর্থ পাণ্ডব মহাত্মা নকুল প্রণীত অশ্বশাস্ত্র এবং জয়দত্ত কৃত "অশ্ববৈদ্যক" মুদ্রিত করত প্রচারিত করিয়াছেন। মহাভারত পাঠকগণ অবগত আছেন যে মহাত্মা নকুল অশ্ব চিকিৎসায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। বিদর্ভপতি নল ও এবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বোধ হয় অশ্ব চিকিৎসাপেক্ষা অশ্ব পরিচালন ও অশ্ব শিক্ষা বিষয়ে সমধিক দক্ষ ছিলেন এবং সূপ (পাক) শাস্ত্রে ও তাঁহার শেষ অভিজ্ঞতা ছিল। প্রাগুক্ত কবিরাজ মহাশয় প্রকাশিত আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থের একটী বিস্তৃত সূচী দেওয়া হইয়াছে, গ্রন্থখানি সম্প্রতি আমাদের নিকট না থাকায় সেগুলির নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অশ্ব-চিকিৎসা সম্বন্ধেও প্রাচীন ভারতে বহু গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল এবং অশ্বের ও অস্ত্র চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজী ভাষায় এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ আছে, তথাপি সংস্কৃত গ্রন্থগুলির প্রচার এবং সেগুলির অনুবাদ প্রকাশ করা প্রয়োজন। হয়ত তাহাতে ও অনেক অভিনব বিষয় জানা যাইতে পারে এবং এতদ্দেশীয় ভৈষজ্যদ্বারা অশ্বের রোগ প্রতিকার ও অধিক মাত্রায় সম্ভাবিত হইতে পারে। অশ্ব প্রতিপালন তাহার শিক্ষা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকাশিত গ্রন্থে অনেক প্রকার উপদেশ আছে। কুতূহলী পাঠকবর্গ-উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠে

প্রাচীন ভারতে অশ্ব চিকিৎসা বিষয়ে কি পরিমাণ উন্নতি হইয়াছিল তাহার কতকটা আভাস পাইতে পারেন।

ইতঃপর আমরা গো চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মহাভারত পাঠে অবগত হই যে পঞ্চম পাণ্ডব শ্রীমৎ সহদেব গো পালনে এবং তাহাদের চিকিৎসায় নিপুণ ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এ পর্য্যন্ত আমরা তৎকৃত গোচিকিৎসা বিষয়ক *কোন গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই। (কামন্দক নীতিসারের শঙ্করাচার্য্য গোতমকৃত গোচিকিৎসা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।) যখন অশ্বশাস্ত্র নিপুণ তদীয় ভ্রাতার সকল গ্রন্থ বিদ্যমান তখন তাঁহার প্রণীত গোপালন বিষয়ক কোন গ্রন্থ যে ছিলনা, একথা বলিতে প্রবৃত্তি হয়না। হয়ত তৎপ্রণীত গ্রন্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথবা তাহা অনাদরে অবহেলায় লোকলোচনের অন্তরালে ভারতের কোনও প্রদেশে কোনও নিভৃত কক্ষে ধূল্যবলুণ্ঠিত ও কীট দষ্টাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতভূমির কোন্ দেশের কোন্ রত্ন-ভাণ্ডারে কত অমূল্য রত্ন লুক্কায়িত আছে তাহা কে বলিতে পারে ? বৈদেশিকগণ সে সমস্ত রত্ন আহরণ করত ধনী হইতেছেন এবং আমরা সে গুলিকে অবহেলায় হারাইতেছি। ইহা আমাদের দশা বিপর্য্যয়েই পরিচায়ক।

"প্রায়ঃ সমাপন্নবিপত্তিকালে, ধীয়োপি পুংসাংমলিনা ভবন্তি।"

সম্প্রতি Colonel L. A. Waddel নামক জনৈক বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ মহাত্মা তিব্বতের প্রধান নগরী লাসা হইতে সহস্রাধিক হস্তলিখিত (Mss) সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সেগুলি অধুনা লণ্ডন নগরীর ইণ্ডিয়া অফিসস্থিত পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় এ গ্রন্থগুলির অধিকাংশই আয়ুর্ব্বেদ সংক্রান্ত। এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ আছে কি না তাহা বলিতে পারি না। কালে বোধ হয় ভারতের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে এই সকল গ্রন্থরাশি হইতে অনেক তত্ত্বই প্রকাশিত হইবে, কিন্তু আমরা তাহার ফলভাগী হইব কি না সন্দেহ।

অগ্নি পুরাণ ও অন্যান্য পুরাণে গো চিকিৎসা বিষয়ে সামান্য ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু এই মহোপকারী জীবের রক্ষার্থে অন্য ঋষিগণ যে প্রকার আগ্রহাতিশয্য ও ঐকান্তিক যত্ন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তদনুযায়ী বৃষায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে কোনও প্রণালী বদ্ধ গ্রন্থ অদ্যাপি আমাদের নয়ন বা শ্রুতিগোচর হয় নাই, ইহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শ্লোকাদি একত্রিত করিলেও গো-চিকিৎসা বিষয়ে কতক বিবরণ জানা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা গজাশ্বাদি চিকিৎসা গ্রন্থের ন্যায় প্রচুর নহে এবং তাহা বিশদ ও নহে। গোজাতির উন্নতি ও অবনতির সহিত ভারতবর্ষের উন্নতি অবনতি অবিচ্ছেদ্য রূপে সম্বদ্ধ। "গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ" একথাতে কোন সন্দেহ

নাই। পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা এই মহতী-বাণীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেছি না; তন্নিবন্ধন ক্রমেই আমরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছি। সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন বিধেয়। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই কথাগুলি বলিতে বাধ্য হইলাম। অনেকের ধারণা এই যে গো-চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়াটা একটা বড়ই হেয় এবং ঘৃণ্য কার্য্য, এমন কি আমরা গো-চিকিৎসককে গোবদ্যি, বলিয়া গালি দিতেও কুণ্ঠিত হইনা, ইহার পরিণাম এই দাঁড়াইয়াছে যে জগতের একটি মহোপকারী জীবের চিকিৎসা প্রভৃতির ভার কতকগুলি অর্ব্বাচীন ও মূর্খের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। চিকিৎসার্থ গো-শরীরে অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়, এই ভ্রান্তিবশতঃ ও অনেক হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি গো-চিকিৎসায় বিরত থাকেন, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তাধিকারে স্মৃতিরশাস্ত্রের যে ব্যবস্থা আছে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর ভ্রম থাকিতেই পারে না। আমরা স্মৃতির দুইটী বচন এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; এতদ্দ্বারাই প্রকৃত তত্ত্ব জানা যাইবে—

দাহচ্ছেদং শিরাবেধং প্রযত্নৈরুপকুর্ব্বতাং
দ্বিজানাং গোহিতার্থায় প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১

অপিচ যন্ত্রণে গো-চিকিসায়াং মূঢ়গর্ভবিদারণে।
যদি কার্য্যে বিপত্তিঃস্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥২

উপর্য্যুক্ত শ্লোকদ্বয়ে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে গাভীর হিতার্থ

(রোগ প্রশমনার্থ) যত্নের সহিত গো-শরীরে দাহ, ছেদ (অস্ত্রাদি প্রয়োগ) প্রভৃতি, করিলে এবং অস্ত্রাদি দ্বারা শিরাবেধ করিলে ব্রাহ্মণের (অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এই তিন বর্ণেরই) কোনও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। শূদ্রাদির পক্ষে ত কোনও কথাই উত্থাপিত হইতে পারে না। অতঃপর চিকিৎসার্থ গোকে বন্ধন করিতে গিয়া (অবশ্য ইহা যত্নের সহিত করিতে হইবে) অথবা গর্ভস্থ মৃতবৎস অস্ত্র প্রয়োগে বহির্গত করিবার সময় যদি গাভী দৈবাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে কোন ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নাই। কূটতর্কজাল বিস্তার করত হয়ত কেহ কেহ বলিবেন যে দ্বিজানাং শব্দে উদ্ধৃত শ্লোকে ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করা হয় নাই, ইহা ব্রাহ্মণস্বামিত্বসূচক মাত্র, তথাস্তু। আমরা কোনও তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ না হইয়া ও একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, প্রাচীন ভারতে গাভীর শরীরে ব্রণাদি বিদারণার্থ এবং মূঢ়গর্ভবিদারণ জন্য অস্ত্র প্রয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল, অন্যথা শাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার অবসর কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? শাস্ত্রকার বিশেষ বিবেচনা ও ভবিষ্যদ্দর্শিতার সহিতই এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় কাহারও বিপ্রতিপত্তি হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট ভারতের নানাস্থানে পশু-চিকিৎসাশাস্ত্রাধ্যয়নার্থ বিদ্যালয় স্থাপিত করত, দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়-গুলিতে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই অধ্যয়ন করিতে পারে এবং

ব্রাহ্মণ সন্তানও গবাদির অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিতেছেন এবং তদর্থে গাভীর শরীরে অস্ত্রাদিও প্রয়োগ করিতেছেন, ইহাতে কোনও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইতেছে না এবং গো-চিকিৎসায় ভদ্র সন্তানগণ আর গো-বৈদ্য বলিয়া উপেক্ষিত ও উপহসিত হইতেছেন না। আমাদের বিবেচনায় ইহা শুভলক্ষণ বটে। প্রসঙ্গাধীন আমরা কতকগুলি অনাবশ্যক কথা আলোচনা করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়াছি, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

শুনিতে পাই "বারাহী সংহিতা"তে, গৃহপালিত ছাগ, মেষ, কুক্কুর প্রভৃতিরও চিকিৎসা প্রণালী বিষয়ে সংক্ষেপে উপদেশ দেওয়া আছে; এতদ্দারা প্রতিপন্ন হয় যে, কোনও জীবই করুণহৃদয় ঋষিদের অসীম দয়ালাভে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। প্রাচীন ভারতে গারুড় বিদ্যা নামক এক প্রকার গুরুমুখী বিদ্যা প্রচলিত ছিল, ইহা বিহগসম্বন্ধীয়। এ বিদ্যাবিষয়ক কোনও গ্রন্থ আছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। সম্প্রতি মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, মহোদয় এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে "শ্যৈনিক শাস্ত্র" নামে একখানা অভিনব ক্ষুদ্রায়তন অতি বিশদ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। এ গ্রন্থখানাতে শ্যেন-পক্ষীর (বাজ-পাখীর) প্রতিপালন, চিকিৎসা ও তদ্দারা মৃগয়া (পাখী শিকার) শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কমযুনাধিপতি

রাজা রুদ্রদেব। এই মহাত্মার আবির্ভাবকাল নির্ণয় জন্য শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কুতূহলী পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়াই সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে প্রাচীন ভারতে পক্ষী পালন ও তাহাদের চিকিৎসার বিষয়েও যে আলোচনা হইত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নরপতিবৃন্দ বিশেষতঃ দেবানাং প্রিয়দর্শী ভারতের একছত্রী সম্রাট মহারাজাধিরাজ অশোক পশু চিকিৎসার নানাবিধ সুব্যবস্থা প্রচলন দ্বারা অহিংসা পরম ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন এবং ইতর জীবের প্রতি অসীম করুণার নিদর্শন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস পাঠক মাত্রই একথা অবগত আছেন। জৈনধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মারাও ইতর-জীবের প্রতি অপরিসীম করুণা পরবশ হইয়া ভারতের নানাস্থানে পশু রক্ষাকল্পে পিঞ্জরাপোল স্থাপন করতঃ দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় বোম্বাই প্রদেশে প্রাচীন ভারতের পশু-চিকিৎসার বহুল প্রচার ও উন্নতির নিদর্শন স্বরূপ পশু-চিকিৎসালয়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এতাবতা সংক্ষেপে যে সমস্ত কথা বলা হইল তাহাতে বোধ হয় প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রাচীন ভারতে গৃহপালিত পশু-চিকিৎসার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ঋষিগণ মনুষ্যায়ুর্ব্বেদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই পশ্বায়ুর্ব্বেদও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদও প্রচার করিয়াছিলেন।

তাঁহারা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে মানবের হিতাহিত গৃহপালিত পশুপক্ষীর হিতাহিতের সহিত অবিমিশ্র ভাবে জড়িত। এখন বোধ হয় একথা বলা অন্যায় হইবে না যে প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ লৌকিকালৌকিক সমস্ত বিষয়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া জগতের হিত কামনাতেই তাঁহাদের সমগ্র শক্তি ও বুদ্ধি নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাদেরই বংশ সম্ভূত আর্য্য সন্তান, আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহাদেরই পবিত্র পদাঙ্কানুসরণ করতঃ নিষ্কাম ভাবে নানা লোক হিতকর শাস্ত্রাদি আলোচনা দ্বারা জগতের হিতসাধন করা। অবশ্য বর্ত্তমানকালে ঋষিদের ন্যায় একেবারে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থভাবে শাস্ত্রালোচনা ততটা সম্ভবপর নহে, তথাপি তাঁহাদের মহান্ আদর্শ সর্ব্বদাই আমাদের নয়নপথ-বর্ত্তী করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া সমীচীন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে পশ্বায়ুর্ব্বেদ সংক্রান্ত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থগুলির প্রচার ও সেগুলির বঙ্গানুবাদ সঙ্কলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এতাদৃশ কার্য্যে দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই সহায়তা করা সর্ব্বথা সঙ্গত। আয়ুর্ব্বেদানুশীলনকারী পণ্ডিতবর্গ মধ্যে যদি কেহ কেহ "গজায়ুর্ব্বেদ", "অশ্বায়ুর্ব্বেদ" ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি পশ্বায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন তবে বিশেষ উপকার হয়। এতাদৃশ কার্য্যদ্বারা যে তাঁহারা নিন্দার্হ হইবেন ও একেবারেই উপেক্ষিত হইবেন, এমন আশঙ্কার কোন কারণ দেখা যায় না। আপনি পশ্বায়ুর্ব্বেদ আলোচনা

দ্বারা যে অর্থাগমের সম্ভাবনা নাই, একথাও সাহস করিয়া বলা যায় না। জৈন সম্প্রদায়ের অনুকরণে বঙ্গদেশের নানাস্থানে পিঞ্জরাপোল স্থাপনের চেষ্টাও অকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য এতাদৃশ্য কার্য্য সম্বন্ধে চেষ্টা বহু অর্থব্যয় সাপেক্ষ হইলেও বর্ত্তমান কালে নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্য্যে অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গের যে প্রকার আগ্রহ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে কতকটা আশার সঞ্চার হইযাছে এবং আমাদের অনুরোধ এই যে শত প্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান মধ্যে গৃহপালিত পশ্বাদির রক্ষা, প্রতিপালন ও চিকিৎসাদির সুব্যবস্থা বিধান ও যেন একটা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। গো-জাতীর উন্নতি ও রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন ও প্রয়াস সর্ব্বথা বিধেয়, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ"। ইংরেজী ভাষায় গৃহপালিত গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ, কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি জন্তুর চিকিৎসা ও প্রতিপালন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ আছে, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নানাবিধ পশুপক্ষী প্রতিপালন সম্বন্ধেও বিস্তর গ্রন্থ আছে। বঙ্গ ভাষাতেও এতাদৃশ গ্রন্থ প্রণয়নদ্বারা ভাষার অঙ্গপুষ্টি সাধন করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় অধুনা কেহ কেহ গো-পালন সম্বন্ধে ২। ১ খানা গ্রন্থ প্রচার করিযাছেন। সেগুলি বিষয় গৌরবে প্রচুর না হইলেও আদরণীয় এবং এবম্বিধ গ্রন্থ প্রচারের পথি প্রদর্শক। মদীয় পিতৃব্য ৺রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ প্রণীত "গোপালন" "অশ্বতত্ত্ব'

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ৪র্থ খণ্ডে সম্পূর্ণ গো-জীবন গো-জাতীর উন্নতি, গদাধর রায় প্রণীত গো-চিকিৎসা এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত গো-পালন এই কতিপয় গ্রন্থের নাম এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে যদি কাহারও প্রাচীন সংস্কৃত পশ্বায়ুর্ব্বেদ আলোচনার এবং বঙ্গ ভাষায় সেগুলির অনুবাদের ও বঙ্গ ভাষায় পশুপক্ষী পালনের গ্রন্থ প্রচারে সদিচ্ছা উন্মেষিত হয়, তবে লেখনী ধারণের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং তৎসহ পরিশ্রমের ও সার্থকতা হয়।

হিঁসারী ষণ্ড।

ভারতে গো-জাতির অবনতি ও তন্নিরোধের উপায় চিন্তা

"নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভীয়েভ্য এবচ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমোনমঃ॥"

আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতভূমি সম্প্রতি নানাপ্রকার দুঃখ ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিয়ত ক্লিষ্ট হইতেছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন ; ইহার অশেষবিধ কারণ বিদ্যমান থাকিলেও গো-জাতির অবনতি এবং ক্রমশঃ বিলোপই যে ইহার একটী প্রধান কারণ, ইহা বোধ হয় নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে। অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, গো-কুলের রক্ষা ও উন্নতির উপরই ভারতবর্ষের কল্যাণ নির্ভর করে। ফলতঃ "গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ" এই প্রসিদ্ধ বাক্যের মূলে গভীর সত্য নিহিত আছে। কৃষি, বাণিজ্য পরিচালন, ভারবহন এবং নানাবিধ পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য

উৎপাদনের মূলীভুত কারণই গোজাতি ধর্ম্ম কার্য্যেও গাভীই হিন্দুজাতির প্রধান অবলম্বন। গো-সদৃশ মহোপকারী প্রাণীর অবনতিতে যে, ভারতের ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহার অসীম উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই ত্রিকালদর্শী আর্য্য মহর্ষিগণ এতাদৃশ জীবের রক্ষা ও উন্নতিকল্পে নানাবিধ সুব্যবস্থা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং গাভীকে সাক্ষাৎ ভগবতী-স্বরূপ ভক্তি করিবার আদেশ ও উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জগতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রাচীন মিসর (Egypt) দেশবাসী জ্ঞানিগণ ও গোজাতির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মযাজকগণও বৃষভচিহ্নাঙ্কিত বস্ত্রদ্বারা তাঁহাদের দেহ আবৃত করিতেন। ইহা গো-জাতির প্রতি ভক্তির নিদর্শণ বলিতে হইবে। সত্য বটে যে, স্মরণাতীত বৈদিক যুগে ভারতীয় আর্য্যগণ গো মেধ-যজ্ঞে গোবধ করিতেন এবং খাদ্য স্বরূপ গোমাংসের ব্যবহার ও তদানীন্তন অপ্রচলিত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়; কিন্তু এবিষয় দেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুবিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত পরলোকগত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাঁহার বেদপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে. বৈদিক-কালে গো-মাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল না। এবিষয় আমার মতামত প্রকাশ করার শক্তি নাই, কারণ আমি বেদে লব্ধাধিকারী নহি। কিন্তু যাহাই হউক, অসীম জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ যখন গাভীর

আত্যন্তিক উপকারিতা এবং গোমাংসের যথেষ্ট অপকারিতা সম্বন্ধে বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন, তন্মুহূর্ত্তেই গো-বধ পাপজনক বলিয়া শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইল এবং ধর্ম্মের শাসনে সকলেই সেই, শাস্ত্রবাক্য অবনত মস্তকে পালন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অদ্যাপি সেই ধর্ম্ম শাসনের বল অপ্রতিহত ভাবে হিন্দুর হৃদয়ে ক্রিয়া করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, গো মাংস ভক্ষণে মানুষ অন্ধতা, কুব্জতা, খঞ্জতা, চক্ষুহীনতা ও কুষ্ঠ প্রভৃতির ভীষণরোগে আক্রান্ত হয়, কেবল তাহাই নহে, এই সমস্ত ব্যাধি পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে সংক্রামিত হইয়া থাকে। চরক সংহিতা পাঠে জানা যায় যে, গো-মাংস ভক্ষণ জনিতই প্রথমতঃ অতিসার রোগের উৎপত্তি হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ও বহু গবেষণাদ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, গোমাংসে এক প্রকার বিষাক্ত কীট জন্মে, তাহা মানবের উদরস্থ হইলেই বহুপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই এবংবিধ কীট অধিক জন্মিয়া থাকে; অতএব ভারতের ন্যায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে গোমাংস যে মানুষের অখাদ্য, ইহা বোধ হয় অবিসংবাদিত সত্য। এই অবস্থায় যদি কেহ বলেন যে, প্রাচীন আর্য্যগণ যখন গোমাংস ব্যবহার করিতেন, তখন বর্ত্তমানকালে তাহা কি অনিষ্টজনক হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা বহু অনুসন্ধান দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে, কূট তর্কজাল বিস্তার করিয়া তাহার পুনঃ প্রচলনের

প্রয়াস পাওয়া অর্ব্বাচীনতার পরিচায়ক। একমাত্র গোমাংস ভক্ষণা-ভক্ষণ দ্বারাই ম্লেচ্ছ ও আর্য্যের মধ্যে পার্থক্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার প্রমাণস্থলে নিম্নলিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ করা বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"গোমাংস খাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহুভাষতে।
সদাচার বিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ:—যে গোমাংস ভক্ষণ করে, বেদবিরুদ্ধ বহু প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে এবং শাস্ত্রোক্ত সদাচার বিহীন হয়, তাহাকেই ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করা যায়। অপ্রসঙ্গাধীন আমি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে কিছুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিশেষ কোন কারণাধীনেই এইরূপ করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক।

গো-জাতির অবনতির অনেক কারণ আছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই প্রধান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, যথা:—

(১) অপালন (২) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব (৩) গোচারণ ভূমির ক্রমশঃ লোপ (৪) গো মড়ক (৫) যথেচ্ছ গো বধের আতিশয্য।

পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেকটী বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইবে। অতএব সমস্ত বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনার চেষ্টা করাই সমীচীন বোধ হয়।

প্রথমতঃ:—অপালন জনিত গোজাতির অবনতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গদেশে এতন্নিবন্ধন

বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। হিন্দু-জাতি গো-রক্ষক হইয়া গাভীর প্রতি যে প্রকার অনাদর ও অযত্ন করিতেছেন, তাহাতে নিতান্তই লজ্জিত ও পরিতপ্ত হইতে হয়। যাঁহারা এই মহানগরীতে ও অন্যান্য সহরে গোজাতির দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নীরবে অশ্রুপাত করিবেন। ফলতঃ কলিকাতায় গাভীর দুর্দ্দশা দেখিলে আর আমাদিগকে গো-রক্ষকের জাতি বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। দূরস্থ পল্লীগ্রামে ও অধুনা যে ভাবে গো-প্রতিপালিত হইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, অচিরেই মহোপকারী প্রাণী বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং দুগ্ধাদি পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে—ক্রমে ক্রমে ক্ষীণবীর্য্য ও হীনবল হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইব। মহামতি মহর্ষি পরাশরের ব্যবস্থা এই যে,—

"পিতুরন্তঃপুরে দত্যান্মাতুর্দদ্যান্মহানসে।
গোষু চাত্মসমং দত্যাৎ স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ অন্তঃপুর রক্ষার ভার পিতার অথবা পিতৃতুল্য ব্যক্তির উপর, পাকশালা পর্য্যবেক্ষণের ভার মাতার অথবা মাতৃতুল্য স্ত্রীলোকের উপর এবং আত্মসম ব্যক্তির উপর গো-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং কৃষিকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিবে। সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গৃহস্থগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, অজাতশ্মশ্রু, অর্ব্বাচীন বালকের উপর এই গুরুতর ভারার্পণ করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিলাম ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন। এক্ষণে যে ভাবে গোশালা নির্ম্মিত হয় এবং তাহাতে যে প্রকার অযত্নে গো সকল

আবদ্ধ থাকে এবং বৎসগুলির প্রতি যে প্রকার অবহেলা প্রদর্শিত হয়, তাহাতে কখনই তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে না। ইহার ফলে গাভীগুলি ক্রমে ক্ষীণকায় ও ষণ্ডগুলি হীনবীর্য্য হইতেছে এবং নিরীহ বৎসগুলি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। এই কারণে দুগ্ধাদির অভাব হইতেছে-এবং কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যাদিরও বিঘ্ন ঘটিতেছে; ভারতের দুঃখ ও দৈন্যও দিনদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

প্রসঙ্গাধীন এস্থলে বক্তব্য এই যে, ষণ্ড ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতি দুর্ব্বল হওয়ায়, ক্ষেত্র কর্ষণের কার্য্য রীতিমত সম্পাদিত হইতেছে না। পল্লীগ্রামে এখন অনেক স্থলে মহিষদ্বারা হলচালন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে নানা অসুবিধা আছে। রৌদ্রের সময় মহিষগুলি একেবারেই পরিশ্রম করিতে পারে না এবং ইহাদের মলে কোনও সার নাই। বিশেষতঃ মহিষগুলি দীর্ঘজীবী হয় না এবং সময় সময় যথেচ্ছ চলিয়া যায়। মহর্ষি পরাশর বলিতেছেন, যে,--

"হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড়্গবং ব্যবসায়িনাং।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবঞ্চ গবাশিনাং।"

এখন প্রায়ই একটি হালের জন্য ২টা মাত্র ক্ষীণকায় বলীবর্দ্দ ব্যবহৃত হয় এবং সময় সময় গাভীদ্বারা ও হল চালিত হয়, ইহা একান্ত অন্যায়। কৃতক্লীব ষণ্ডদ্বারাও হল নিষিদ্ধছিল, বণ্ডই এই কার্য্যে নিযুক্ত হইত।

ক্ষেত্রকর্ষণ সময়ে বলদগুলিকে কৃষকগণ যেরূপ নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে থাকে, তাহা দেখিলে নিশ্চয়ই কষ্টানুভব হয়। ৮টী ষণ্ডদ্বারা একটা হল চালিত হওয়া এখন সহজ নহে, তথাপি ২টী দ্বারা হল চালন বড়ই অন্যায়, একথা বলিতেই হইবে।

পক্ষান্তরে ইয়ুরোপীয়ান (যাঁহারা গো-খাদক বলিয়া খ্যাত) গো-পালন সম্বন্ধে কত প্রকার সুব্যবস্থা ও কীদৃশ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পশুপালন (কৃষিকর্ম্মার্থ গো-অশ্বাদি প্রতিপালন) ব্যাপারটা কৃষিকার্য্যেরই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে সুপালন জন্য এক একটি গাভী ।৫ সের হইতে ১/ মণ পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে এবং এক একটা ষণ্ড ৪। ৫ হাজার হইতে ১০০০০৲ টাকা মূল্যেও বিক্রীত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে দ্রোণদুগ্ধা গাভী বর্ত্তমান ছিল (৩২ সের দুগ্ধদাত্রীকে দ্রোণদুগ্ধা বলা হইত)। একথা কবিকল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের গাভীগুলি যখন ২৭।৩০ সের দুগ্ধ দিতেছে, তখন ভারতের ন্যায় শস্যশ্যামল ও অযত্ন সম্ভূত প্রভূত তৃণ-শস্যাদিপূর্ণ স্থানে দ্রোণদুগ্ধা গাভী ছিল, তাহার সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমরা লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি, তাই আজ ভারতে দ্রোণদুগ্ধা গাভীর অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। ভারতের ব্রহ্মণ্যদেব 'গো-ব্রাহ্মণ-হিতায়' ছিলেন; আমাদেরই কর্ম্মদোষে তিনি এখন 'তদ্বধায়'

হইয়াছেন ; কি বিড়ম্বনা। ভারতের এখনও পাঞ্জাব প্রদেশে হিসারী, মুলতানী এবং মান্দ্রাজ প্রদেশে গুজরাট দেশে, কাটেবারী, মধ্য-প্রদেশে নাগৌরী এবং পাটনা অঞ্চলের গাভীগুলি প্রচুর দুগ্ধবতী, যত্ন করিলে ইহারা ২৫। ৩০ সের দুগ্ধ দিতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে আমরা উদাসীন। বঙ্গদেশের গাভীগুলি /২। সের বা /২॥ সেরের অধিক দুগ্ধ দেয় না, ইহারা অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি এবং অস্থিচর্ম্মসার। বাঙ্গালীর বুদ্ধিমত্তা সর্ব্বত্র খ্যাত, কিন্তু বঙ্গদেশের জীবজন্তুর অবনতি দেখিলে আর সে বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করা যায় না। পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশের এক একটী ছাগীতেও ৫। ৬ সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। কেবল অপালন জন্যই বাঙ্গালী গাভীগুলির এই প্রকার হীনদশা উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য জলবায়ুর দোষ যে কতকটা না আছে তাহা নহে, কিন্তু যত্ন চেষ্টা করিলে, এই দোষ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। বর্ত্তমানকালে দুগ্ধাদির যে প্রকার অভাব হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি গো-জাতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত, নতুবা গবাদির অপালন-জনিত-ক্ষতি প্রত্যহ গুরুতর হইতে থাকিবে। শিক্ষিত লোক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে অনেক উপকারের আশা করা যায়, কারণ "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ। সযৎ প্রমাণংকুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।" Example is better than precept, কেবল সভা-সমিতি ও বক্তৃতাদ্বারা কোন কার্য্য হয় না। গো-পালন সম্বন্ধে ইংরেজী

ভাষার অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে; বাঙ্গালা ভাষায় এবম্বিধ গ্রন্থ ২। ৪ খানা মাত্র দেখিতে পাই : কোন্ কোন্ গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী, এ বিষয় প্রবন্ধের শেষাংশে বলা যাইবে।

গো-জাতির অবনতির দ্বিতীয় কারণ—পুষ্টিকর খাদ্য ও গোচারণ-ভূমির অপ্রাচুর্য্য। কল্ক (খোল) ভূষি প্রভৃতি দেশে ক্রমে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইতেছে এবং তজ্জন্য খাদ্যদ্রব্যে নানাপ্রকার কৃত্রিমতা বাড়িতেছে, পক্ষান্তরে অন্য কোনও প্রকার পশু-খাদ্য উৎপাদনের রীতিমত চেষ্টা হইতেছে না, ইহার ফলে গো-কুল ক্রমে খাদ্যাভাবে জীর্ণশীর্ণ হইতেছে এবং ইহার পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। ভারতবর্ষে গোচারণ ভূমির অভাব ছিলনা, এখন তাহা ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামেই গোচর রক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং ইহা পুণ্যজনক ও ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া লোকের ধারণা ছিল; এখন অর্থই আমাদের পরমার্থ হইয়াছে; ধর্ম্ম হীনবল হইতেছে এবং পুণ্যকার্য্যে আর আমাদের প্রবৃত্তি নাই। প্রাচীন শাস্ত্রে গোচারণ ভূমি রাখার সুব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু সেগুলি আর আমরা পালন করিতে প্রস্তুত নহি। জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষি সম্প্রদায় কাহারও কাহারও নিকট দ্রব্য বিশেষসেবী বলিয়া আখ্যাত হইতেছেন। এই প্রকার হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ "প্রায়ঃ সমাপন্ন বিপত্তিকালে ধিয়োহপি পুংসাং মলিনী ভবন্তি।" সে দিন উত্তর অঞ্চলের ছোট লাট বাহাদুর গোজাতির রক্ষা ও উন্নতির বিষয়ে আলোচনার জন্য

একটী সমিতি করিয়া অনেক শুভজনক প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে গোচরণ ভূমি রক্ষার জন্য প্রত্যেক ভূস্বামিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। বোধ হয়, এ বিষয়ে রাজবিধিও সত্বরই প্রচারিত হইবে। ভরসা করি, বঙ্গদেশীয় রাজপুরুষগণও এসম্বন্ধে মনোযোগী হইবেন। আমাদের দেশে (ময়মনসিংহের উত্তরাংশে) সুসঙ্গ ও সেরপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ভূমি আছে, এবং তাহাতে এখনও গোচারণের সুবিধা আছে, কিন্তু কালে তাহাও লুপ্ত হইবে। অর্থ লোভ বা'ড়লেই আর পতিত ভূমি থাকিবে না। পাশ্চাত্য-দেশে পশু-খাদ্য নানাবিধ তৃণাদি জন্মানর অনেক চেষ্টা হইতেছে। Silage প্রথাদ্বারা (ঘাস ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া) ঘাস রাখিবার ব্যবস্থা অতি সুন্দর। আমাদের দেশেও অনায়াসে তাহা অবলম্বিত হইতে পারে। অনেক স্থলে বিবিধ পুষ্টিকর তৃণ উৎপন্ন হয়, সেগুলি রীতিমত রক্ষা করিলেও গবাদির খাদ্যাভাব হয় না। এ বিষয়েও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগী হওয়া বিধেয়। খড় বিচালী হইতে Silage প্রথায় রক্ষিত ঘাস অনেক উৎকৃষ্ট এবং পুষ্টিকর। দুর্ব্বা ঘাসের রীতিমত চাষ করিলেও অনেক সুবিধা আছে। অতঃপর গিনি, বিয়ানা, সরযোম প্রভৃতি বৈদেশিক ঘাসেরও চাষ করান যাইতে পারে। আমার বিবেচনায়, দুর্ব্বা, নল, খাগড়া, উলু, বিরণ এবং আরও অনেক প্রভৃতি ও এতদ্দেশ জাত তৃণাদিই ভারতীয় গাভীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পশু

খাদ্য নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে (শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে F. R. H. S.) এসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। কার্পাস বীজ দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য, অতএব কার্পাসের চাষে মনোনিবেশ করা আমাদের কর্ত্তব্য। ইহাতে বিবিধ উপকার হইতে পারে, পশু খাদ্য পাওয়া যাইবে এবং তূলাও উৎপন্ন হইবে। সর্ষপের কল্ক (খোল) ষণ্ড ও বলীবর্দ্দ প্রভৃতির পক্ষে ভাল। কিন্তু দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে তিল এবং তিষির খোলাই উৎকৃষ্ট। গবাদির খাদ্য সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা করিতে হইলে ইহার কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, অতএব তাহাতে বিরত হইলাম।

অতঃপর গো জাতীর অবনতির অপর কারণ—গো মড়ক সম্বন্ধে ২। ৪টী কথা বলা যাউক। গোবসন্ত, গলাফুলা, পেটফুলা প্রভৃতি সংক্রামক ও মারাত্মক ব্যাধিতে প্রতিবর্ষে যে কত গাভী বৎস ও ষণ্ড প্রভৃতি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই সকল ব্যাধি উপস্থিত হইলে এক একটা গ্রাম একেবারে গো-শূন্য হইয়া পড়ে. ইহাতে কৃষক ও গৃহস্থগণ যে কি প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে ২। ৪ জন গো-বৈদ্য থাকিত, তাহারা অনেক গোকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিত, অধুনা তাহাদের প্রতি হতাদর হওয়ায় গো-বৈদ্য লুপ্ত

প্রায় হইয়াছে। ভেটার্ণারী বিদ্যালয়ে যে সমস্ত যুবক শিক্ষা লাভ করিয়া গো-বৈদ্য হইতেছেন. তাঁহাদের দ্বারা দরিদ্র কৃষক ও গৃহস্থান বিশেষ উপকৃত হইতেছে না ; তাঁহাদের ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধাদিও দূরস্থ গ্রাম সমূহে সহজ লভ্য নহে এবং সকলের পক্ষে তাহা ক্রয় করাও সম্ভবপর নহে। এইরূপ অবস্থায় ইঁহাদের দ্বারা গো-চিকিৎসার বিশেষ সহায়তা হইতেছে না।

অতঃপর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম অবগত না থাকাতে সামান্য কৃষক ও গৃহস্থগণ গোমড়ক উপস্থিত হইলে তাহার কোন প্রতিকারই করিতে পারে না। এবং উপকারীতা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় এ বিষয়ে তাহারা একেবারেই উদাসীন। গো-মড়কে দেশ গো-শূন্য হইয়া যাইতেছে, ইহার ফলে দুগ্ধাদির অভাব বাড়িতেছে এবং শস্যাদি ক্রমে দুর্মূল্য হইতেছে. ভারতবর্ষ নিত্য দুর্ভিক্ষের আগার হইতেছে। এক গো জাতির অপচয়ে দেশের কি হইতে পারে তাহা নিম্নলিখিত Report এ ব্যক্ত হইতেছে—

There is a fact much to be regretted in connection with Indian cattle viz that some of the best Breeds are deteriorating in quality an quantity. Among the many difficulties in the tracks of Indian Govt. I look to the degeneration of the indegenous Breeds, is likely to occupy a prominent place,......They are of far greater importance to India than they are to Great

Britain. If by one fell swoop the cattle of the British Isles were annihilated, the want of the public could be supplied from other sources, ...but it is not so in India. Cattle there supply nearly all the motor power of the farm. Conditions are alike unsuitable for the employment either of Horse or the Steam Engine. In short, nothing, even the foreign cattle, can be substituted for Indian cattle to do the work for which they are now mainly bred and kept.

ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে গো-জাতির লোপাপত্তিতে যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না। বিগত ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দের আদম সুমারীতে (Cencus Report) দেখা যায় যে, প্রায় ২০০,৮৪৯, ২৫৬ জন (অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৬৯.৯২ জন) লোক কৃষিকার্য্য ও তৎসংসৃষ্ট নানাবিধ কার্য্যে লিপ্ত আছে এবং এবম্বিধ কার্য্যাবলীতে গোই প্রধান সহায়। এইরূপ অবস্থায় গোমড়কে লক্ষ লক্ষ গো শমন ভবনে গমন করিলে কৃষকের ও সমগ্র দেশের কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

এক্ষণে গোবধ ও চর্ম্ম ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে গো-হত্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মানুষের খাদ্যস্বরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য ভারতবর্ষে সম্প্রতি অতি যথেচ্ছভাবে গোবধ

করা হইতেছে, ইহা নিবারণ করা আমাদের সাধ্য নহে। মুসলমান ভ্রাতৃগণ এসম্বন্ধে মনোযোগী হইলে অনেকটা উপকার হইতে পারে। ঈদ প্রভৃতি পর্ব্ব-উপলক্ষে যে গো-বধ করিতেই হইবে, কোরাণ সরিফের বোধ হয় ইহা অভিপ্রেত নহে। এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা আমার ধৃষ্টতা মাত্র। গো-মাংস এদেশের উপযোগী নহে এ কথা ভাল রকম বুঝিতে পারিলে বোধ হয় অনেক গো-মাংস ভোজীই ইহার ব্যবহারে বিরত হন। মুসলমান নরপতি মহামনস্বী আকবর এক সময়ে গো বধ রহিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু নানা প্রতিকূল কারণে তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যথেচ্ছ গোবধ হইতে পারে না, খাদ্যস্বরূপে ষণ্ডের মাংসই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, ইহা মন্দের ভাল বটে। বলিতে লজ্জা হয় এবং দুঃখও হয় যে 'হিন্দু' নামধারী আমাদের গোপাল (গোয়ালাগণ) প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে গোবধের সহায় হইতেছে। ব্যবসায়ের লোভে তাহারা গোবৎসগুলিকে ৮।১০ দিবস বয়স্ক হইলেই কষায়ের নিকট বিক্রয় করিতেছে, অতঃপর ফুঁকা প্রভৃতি নিষ্ঠুর উপায়ে গো-দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া তাহাতে ত্রিগুণ কি ততোধিক জলমিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছে, ঐ জল সময় সময় এত দূষিত থাকে যে, তাহাতে নানা রোগোৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। গাভীটি বৃদ্ধা হইলে, অথবা দুগ্ধ ছাড়াইলে তাহাকে ও কষায়ের নির্দ্দয় হস্তে অর্পণ করিতেছে। হায়রে অর্থ, তোর

কি মোহিনী শক্তি ! অর্থ লোভে মানুষ কতই না অপকার্য্য করিতেছে। মাড়োয়ারী ভ্রাতৃগণ দয়াপরবশ হইয়া পিঞ্জরাপোল স্থাপন করিয়া এই নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে গাভীগুলিকে কিয়ৎ-পরিমাণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে ও আশানুরূপ ফল হয় নাই। দেশের সর্ব্বত্র পিঞ্জরাপোলের ন্যায় অনুষ্ঠান হওয়া কর্ত্তব্য।

অতঃপর চর্ম্মব্যবসায়ীগণ ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনের লোভে বিষপ্রয়োগদ্বারা অনেক গোহত্যা করিতেছে। পল্লীগ্রামে এ প্রকার নিষ্ঠুরতার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। চর্ম্ম ব্যবসায়ে নিষ্ঠুরতা হয় বলিয়াই বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রে দ্বিজাতির পক্ষে ইহার ব্যবসায় নিষিদ্ধ হইয়াছে। অধুনা আমরা সেই নিষেধ অমান্য করিতেছি, ইহার পরিণাম শুভজনক কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কঠোর রাজবিধি প্রচলিত সত্বেও প্রতিবর্ষে বিষপ্রয়োগে অনেক গোহত্যা হইতেছে। ইহার প্রতিবিধানের উপায় কি ?

গোজাতির অবনতির প্রধান কারণগুলির সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এবার কি উপায়ে ইহার গতি-রোধ হয়, তৎসম্বন্ধে ২।৪টা কথা বলা প্রয়োজন। আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে যত অধিক আলোচনা হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

প্রথমতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং বঙ্গীয় ধনী সম্প্রদায় এবং ভূম্যধিকারীবর্গের মনোযোগ ব্যতীত গোজাতির রক্ষা ও উন্নতি সুদূরপরাহত। আমার বিবেচনায়— -

১। স্থানে স্থানে গোশালা (Dairy farm) প্রতিষ্ঠা।

২। গো-চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও গ্রামে গ্রামে গো-বৈদ্য প্রেরণ।

৩। গো-চিকিৎসা ও পালন প্রভৃতি বিষয়ে সরল ভাষায় গ্রন্থাদি প্রচার।

৪। গোচারণ-ভূমি রক্ষার উপায় উদ্ভাবন।

৫। সর্ব্বোপরি যথেচ্ছ গোবধ নিবারণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

গোশালা (Dairy) প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যৌথ সম্প্রদায় (Joint stock) গঠিত করা প্রয়োজন এবং গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত ও কোনও বিখ্যাত Dairyতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত; নতুবা কেবল Theory (উপপত্তিতে) কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। আমরা অনেক সময়েই অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়াই অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, পরিশেষে সফলতা লাভ না করিয়া হতাশ্বাস হই এবং কার্য্যে উৎসাহ ও উদ্যম ভগ্ন হয়। এবম্বিধ নিষ্ফলতাই আমাদের উন্নতির পরিপন্থী। Dairy farming সম্বন্ধে অনেক ইংরেজী গ্রন্থ আছে; সেগুলি বঙ্গভাষায় অনুদিত করা উচিত।

সদ্যঃ পততি লৌহেণ ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ

দুগ্ধ ও গাভী বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু এখন অনেক তথা কথিত ব্রাহ্মণ সন্তান চর্ম্মাদি ও বিনামা

প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছেন। ইহাও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। অত্রাবস্থায় দুগ্ধাদি বিক্রয় করা একান্ত অন্যায় হইবে না। চর্ম্মবিক্রয় অপেক্ষা ইহাতে যে অধিক পাপ আছে, তাহা বোধ হয় না। গো-দুগ্ধাদি বিক্রয় করিলে ব্যবসায় লোভে গবাদির প্রতি নিষ্ঠুরতা হইবে বিবেচনাতেই বোধ হয় তাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্রের ব্যবস্থা অযৌক্তিক বা অসঙ্গত নহে।

গোপালন ও গোচিকিৎসা সম্বন্ধে বঙ্গ ভাষায় গ্রন্থ প্রচার আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর পথ প্রদর্শক হইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত গোপালন নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থই বোধ হয় বঙ্গ ভাষায় প্রথমস্থানীয়। অধুনা হুগলী (রামপদ) নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ খণ্ডে গো-জীবন নামক পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গো-জাতির উন্নতি ও গোধন রক্ষা নামক আরও দুই খানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার কোনটীই আমাদের অভাব পূরণে যথেষ্ট নহে। এতদপেক্ষা বিস্তৃত ও বিশদ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইংরেজী ভাষায় ভারতবর্ষের গো সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি গো-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ্য :—

১৮৭১ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে গবাদির মারাত্মক গো বিষয়ক একখানি পুস্তক বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখানিও পাঠ্য বটে।

1. Cow keeping in India (by Isa Tweed)
2. Cows in India (by E. B. T.)
3. A mature Dairy farming (by Landolicus)
4. Plain Hints to the deseases of cattle in India (by Vety. Captn. Jame's Miller.)
5. India Cattle (by J. Shortt.)
6. Dairy farming in India (Govt. publication by Vanghan & Nash.)

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ সমূহ হইতেও গোপালন এবং গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে।

1. Every man his own Cattle Doctor (by Bomatage.)
2. Bovine prescriber (by George Grasswell,)
3. Animal plague (by Fleming George.)
4. Principles and practice of Bovine Medicine and Surgery (J. w. Hill)
5. Cattle Breeds and Management (by W. Housman)
6. Stock keeping and Cattle Nursing (A. Roland.)
7. Treatise on the Diseases of ox (by J. H. Steel.)
8. Farm Live stock in Great Britain (by Robert Wallace.)

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ইংলণ্ডীয় গোজাতির জন্যই লিখিত, তথাপি আবশ্যক বোধে এগুলি হইতেও অনেক বিষয় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নাটক, নভেল প্রভৃতি বঙ্গ-ভাষায় যথেষ্ট হইয়াছে, ও হইতেছে, (যদিও ইহারা অধিকাংশই পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না) অধুনা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচারের সময় উপস্থিত হইয়াছে। কৃতবিদ্যগণের এ বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত ভাষায় গোপালন সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক পুরাণে অনেক শ্লোক আছে। সেগুলি একত্রিত করিয়া প্রচার করা কর্ত্তব্য। মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, সহদেব গো-চিকিৎসায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন এবং পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত বাসকালে বিরাট ভবনে তিনিই গো-চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার প্রচারিত কোনও গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত দেখি নাই। বোধ হয় তাহা থাকিতে পারে, কারণ নকুলকৃত অশ্বশাস্ত্র পাওয়া যাইতেছে এবং Asiatic Society কর্ত্তৃক তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে বৃন্দাবনে গোধন চরাইতেন, ইহা সর্ব্বজন বিদিত। আদর্শ মহাপুরুষ ভগবানের অবতার গোচারণ করিতেন, ইহা হইতে আমরা বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারি। ফলতঃ এক সময়ে গোধনই ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ছিল।—

তৃনাণি খাদন্তি বসন্ত্যরণ্যে
পীত্বাপি তোয়ান্যমৃতং স্রবন্তী।
যদ্‌গোময়াদ্যশ্চ পুনন্তি লোকান্
গোভির্তুল্যং ধনমস্তি কিঞ্চিৎ॥

"গাবঃ পবিত্রা মাঙ্গল্যা গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ
শকৃন্মূত্রং পরস্তাসা ন লক্ষ্মীনাশনং পরম্॥"

আমাদের শাস্ত্রে সপ্ত মাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন; তন্মধ্যে গাভী একটী। যথা:—

আত্ম-মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজদারিকা।
গাভী ধাত্রী ধরিত্রী চ সপ্তৈতে মাতরঃ স্মৃতাঃ॥

বস্তুতঃ গাভী আমাদের মাতৃতুল্যা, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

পঞ্চগব্য (দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র) আমাদের প্রত্যেক দৈব ও পৈত্র্যকার্য্যে ব্যবস্থেয় হইয়াছে এবং হবির্ব্রহ্ম (ঘৃতব্রহ্ম) একথাও বলা হইয়াছে। যাঁহারা শ্রাদ্ধক্রিয়াতে গোদানের মন্ত্রগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন, তাহারা বুঝিতে পারেন যে, শাস্ত্রকারগণ গাভীকে কি উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং কি পবিত্রভাবে দেখিয়াছেন। এ সমস্ত বিষয় অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতে বাধ্য হইলাম। কুতূহলী শ্রোতৃবর্গ এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে হিন্দু-শাস্ত্র-গ্রন্থগুলি একবার পাঠ করিবেন। গোদানের অনেক ফল শাস্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে।

উপসংহার কালে Breeding বৈজিক তত্ব সম্বন্ধে ২। ৪টী কথা বলা যাইতেছে। দেশে গো-জাতির উন্নতি বিধান করিতে হইলে Breeding সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। পূর্ব্বকালে শ্রাদ্ধবাসরে যে বৃষোৎসর্গ করা হইত, তাহার উদ্দেশ্য বোধ হয় গোবংশের বিস্তৃতিসাধন। হৃষ্ট, পুষ্ট, সুস্থ ও উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতীর বৎসই উৎসর্গ করা শাস্ত্রের আদেশ। বৎসটী তিন বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই, কারণ এই বয়স হইতেই ষণ্ড সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হয়, ইহা হইতে অপরিণত বয়স্ক ষণ্ডে বৎস ভাল হয় না। বর্ত্তমানকালে আমরা যে কোনও প্রকার একটা ষণ্ড উৎসর্গ করিতেছি এবং ইহাতেই অখণ্ডপুণ্য সঞ্চয় করিতেছি ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আছি। আমাদের শাস্ত্রের মহান্ উদ্দেশ্য এই প্রকারে বিফল হইতেছে। উৎকৃষ্ট জাতীয় ষণ্ড নিকৃষ্ঠ গাভীতে উপগত হইলে যে বৎস হয়, তাহা মাতা অপেক্ষা ভাল হয় এবং মাতার দুগ্ধও বাড়িয়া যায়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ; কিন্তু তদ্বিপরীতে ফল বিরুদ্ধ হয়। অতএব এ বিষয়ে Breeding কারীদের লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের শাস্ত্রে যে অনুলোম বিবাহ বৈধ এবং প্রতিলোম অবৈধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহারও কারণ এই। রুগ্ন ষণ্ড, ৮ বৎসরের অধিক বয়স্ক ষণ্ড, Breeding কার্য্যের অনুপযোগী। Breeding সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বোক্ত ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিতে দ্রষ্টব্য। গাভী পুষ্পবতী হইবার অব্যবহিত পরেই ষণ্ডোপগতা হইলে স্ত্রী জাতীয়

বৎস এবং কালবিলম্ব হইলে পুংবৎস হওয়ার সম্ভাবনা অধিক অতএব এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া গাভীর পাল দেওয়াইতে পারিলে আশানুরূপ ফল লাভ করা যায়, ইহা পরীক্ষিত সত্য। বঙ্গদেশীয় পল্লীগ্রামের ভূম্যধিকারীগণ ভাল ভাল ষণ্ড পালন করিলে নিজের গাভী সকল উন্নত হয় এবং প্রজাদেরও সুবিধা হয়। প্রত্যেক গ্রামে ২। ১টী ষণ্ড মুক্তাবস্থায় রাখিতে পারিলে Breed ভাল হয়, ইহাতে শস্যহানির আশঙ্কা আছে বটে, কিন্তু যে ক্ষতি হয়, একটী উৎকৃষ্ট বৎস হইলে তাহার চতুর্গুণ লাভ হয়। অতএব এইরূপ সামন্য ক্ষতি গণনা করাই উচিত নহে। স্থানে স্থানে গো-রক্ষণি সভা স্থাপন করিয়া কৃষক ও গৃহস্থগণকে গো-পালন প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দেওয়াও ভাল মনে হয়। কলিকাতা নগরীতে এবং অন্যান্য সহরে যাঁহারা বাস করেন, স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশে ও তাঁহাদের (অবশ্য যাঁহারা সমর্থ তাঁহাদের) ২। ১টী ভাল গাভী পালন করা উচিত, ইহাতে নানাপ্রকার সুবিধা আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই একথা বলিতে সাহসী হইয়াছি। বাজারের কৃত্রিম দুগ্ধ সেবনেই যে কলিকাতায় নানাপ্রকার পীড়ার প্রকোপ বাড়িতেছে, এ সম্বন্ধে রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয় সে দিন খাদ্য সম্বন্ধে বক্তৃতায় বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমি সাহিত্য-সভায় ইতঃপূর্ব্বে "দুগ্ধ" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে ও অনেক কথা বলা হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, গো-পালন ব্যতীত

আমাদের স্বাস্থ্য সম্পত্তি কিছুই রক্ষিত হইতে পারে না, এই জন্যই গোজাতির অবনতিতে আমাদের কি কি অনিষ্ট হইতেছে এবং তাহা কি প্রকারে নিবারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে যথা শক্তি আলোচনা করিলাম।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অনেক অসম্বন্ধ কথা থাকিতে পারে এবং অনেক কথা অনুক্ত ও আছে; কিন্তু ইহাদ্বারা যদি কাহারও গো-পালনের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হয় এবং গোজাতির অবনতি নিবারণ ও তাহার উন্নতি সাধনের ইচ্ছা বলবতী হয়, তবেই শ্রম সার্থক মনে করিব। উপসংহারে নিবেদন, গো-মাতার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বঙ্গীয় হিন্দুগণ যেন তাঁহাদের হিন্দু নামের সার্থকতা রক্ষা করেন এবং "গোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ" একথা যেন সর্ব্বদাই মনে রাখেন। একথা যেন মনে থাকে যে, গো-ব্রাহ্মণের রক্ষাতেই ভারতবর্ষ সুরক্ষিত, ইহাদের অবনতিতেই ভারতের দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী।
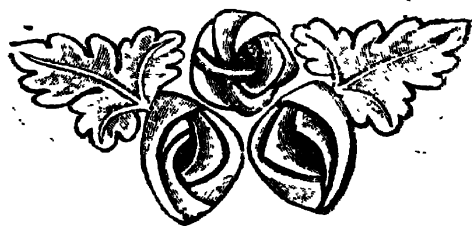
দুগ্ধ

প্রস্তাবনা

(১)

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, এই পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী (Mammalia) জীব মাত্রের শৈশবকালে এবং মানবের পক্ষে সর্ব্বাবস্থায় এমন কি খাদ্য আছে, যাহাতে একাধারে সমস্ত পুষ্টিকর ও উপাদেয় পদার্থ বিদ্যমান? তদুত্তরে বোধ হয় নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যায় যে, তাহা "দুগ্ধ"। ফলতঃ একমাত্র দুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়াই জীবন ধারণ করা যাইতে পারে একথা অলীক বা অত্যুক্তি নহে। কি বাল্যে, কি বার্দ্ধক্যে, কি সুস্থাবস্থায়, কি রুগ্নাবস্থায়, দুধের ন্যায় পরম হিতকারী ও জীবনীয় পদার্থ আর নাই। মাতৃস্তন্য ত্যাগের পর মানবের পক্ষে যে সমস্ত প্রাণিজ দুগ্ধ ব্যবহার্য্য, তন্মধ্যে গোদুগ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অতএব এই প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধেই যথা সম্ভব বিস্তৃতভাবে এবং অপরাপর প্রাণিজাত দুগ্ধের বিষয় আনুষঙ্গিকভাবে, সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইবে।

স্তন্য পানের উদ্দেশ্য ও সন্তানের সংখ্যানুসারে স্তন্যপায়ী জীবের স্তনসংখ্যা ও সংস্থান সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ বিষয়ে ভগবানের সৃষ্টিকৌশল ও বৈচিত্র্য নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলে মুগ্ধও বিস্মিত হইতে হয়। কোনও কোনও জীবের সন্তানের সংখ্যা-ধিক্যের সহিত মাতৃস্তনের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়; কিন্তু কোনও

কোনও স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ "গিণিপিগ্" নামক ক্ষুদ্র প্রাণী এবং "ছাগীর" বিষয় বলা যাইতে পারে। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমোক্তটী একবারে ৮। ১০টী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার দুইটী মাত্র স্তন। ছাগীও এককালীন একবা ততোধিক সন্তান প্রসব করে, কিন্তু তাহারও দুইটী স্তন। এ সম্বন্ধে আরও অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে, বাহুল্য বিবেচনায় তাহা করা হইল না।

জীবতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আরণ্য ও গৃহপালিত পশুর মধ্যে দৈহিক গঠন ও স্তনাদির সংস্থান বিষয়ে অনেক পার্থক্য জন্মিয়াছে; এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

Copyu—(কোপিয়্ নামক এক প্রকার জলচর ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী জীব আছে; সন্তরণ কালে সে তাহার শাবককে পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে, তৎকালে মাতার স্তন দুইটী তাহার স্কন্ধদেশের পার্শ্ব দিয়া উর্দ্ধমুখে উত্থিত হয়, ইহাতেই শাবক অনায়াসে দুগ্ধ পান করিতে পারে। উপরোক্ত কারণেই এই প্রাণীর স্তন দুইটী অতিশয় দীর্ঘাকৃতি। এই প্রকারে দেখা যায় যে, জীবজগতে ভগবানের কি বিচিত্র কৌশল প্রকটিত হইয়াছে।

(২)

দুগ্ধের সংজ্ঞা, স্বরূপ, * ব্যুৎপত্ত্যর্থ ও পর্য্যায় শব্দ।

স্তন্যপায়ী, স্ত্রীজাতীয় জীবমাত্রেরই সন্তান প্রসবান্তে তাহাদের

---

* ... Milk, Cheese and Butter ...

স্তনাগ্রস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রন্ধ্র পথে আকর্ষিত হইয়া যে শুভ্র, তরল, স্নিগ্ধ মসৃণ ও সুস্বাদু পীযূষধারা নির্গত হয় তাহাকেই "দুগ্ধ" বলা যায়। সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে ;—

"রস প্রসাদো মধুরঃ পক্কাহারনিমিত্তজঃ।
কৃৎস্নদেহাৎ স্তনৌ প্রাপ্তঃ স্তন্যমিত্যভিধীয়তে ॥"

রসপ্রসাদঃ—রসস্য সার ইতি।

অর্থাৎ স্তন্যপায়ী স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর আহার্য্য দ্রব্যাদি পক্কাশয়গত হইয়া জীর্ণ হইলে, তাহাতে যে রস জন্মে, ঐ রসের সারভাগ সমস্ত শরীর হইতে স্তনে যাইয়া "স্তন্য" (স্তনদুগ্ধ) নামে কথিত হইয়া থাকে। ভাব প্রকাশে কথিত হইয়াছে যে ঃ—

"স্তন্যং ত্রিরাত্রাৎ স্ত্রীণাং চতু রাত্রাদনন্তরং।
প্রবর্ত্তয়ন্তি বিবৃতা ধমন্যো হৃদয়ে স্থিতাঃ ॥"

অর্থাৎ প্রসবান্তে তিন বা চারি রাত্রির পর হইতে স্ত্রীদিগের হৃদয়স্থ ধমনীসমূহ প্রসারিত হইলে, স্তন্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

প্রসবান্তে ৩। ৪ দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতীয় স্তন্যপায়ী জীবগণের স্তন হইতে যে এক প্রকার হরিদ্রাভ, পূযবৎ পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত হয়, তাহাকে ইংরেজী ভাষায় Colstrum (কলষ্ট্রাম) বলে। ইহার রাসায়নিক গঠন ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চাৎ বিস্তৃতভাবে বলা যাইবে।

(ক) রাজ নিঘণ্টুতে দুগ্ধের শ্বেতত্বের কারণ এই প্রকার কথিত হইয়াছে ;—

"ক্ষীরং স্নিগ্ধং তথা রক্তং পিত্তেন পক্বতাং গতং
রক্তং শ্বেতত্বমায়াতি তথা ক্ষীরং সিতং ভবেৎ ॥"

তাৎপর্য্যার্থ ঃ—দুগ্ধ স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত অথবা নবনীতযুক্ত) পিত্তদ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া রক্ত শ্বেত বর্ণ ধারণ করে, তাহাতেই দুগ্ধ শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে (কারণ রক্তে পরিণত হইলেই রস এবং রসই দুগ্ধে পরিণত হয়)। এই দুগ্ধ মাতৃহৃদয়ের অতুলনীয় স্নেহরাশি বিগলিত হইয়াই যেন স্তনমুখে প্রবাহিত হয়। সন্তানের আকর্ষণ ব্যতীতও কেবলমাত্র তাহার দর্শন, স্পর্শন, স্মরণ অথবা গ্রহণ জনিত হর্ষ ও স্নেহবশতঃ আপনা আপনই ক্ষরিত হইতে থাকে ; অতএব স্নেহ ও হর্ষই দুগ্ধ ক্ষরণের অন্যতম কারণ। মাতৃ জঠরে সন্তানের অবস্থানের কাল হইতেই মাতার স্তনমণ্ডলে ভাবি সন্তানের আহার্য্য, পীযূষরাশি সঞ্চিত হইতে থাকে ; ভগবানের লীলা ও করুণার অন্ত নাই।

জগতে যত কিছু পবিত্র ও নির্ম্মল পদার্থ আছে, তৎসমস্তকেই আমরা দুগ্ধের সহিত তুলিত করিয়া থাকি। শুভ্র আস্তরণযুক্ত শয্যা "দুগ্ধফেননিভ" বলিয়াই বর্ণিত হয়। মহাকবি ভবভূতি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "উত্তর রামচরিত" নাটকে সকরুণ দৃষ্টির সহিত দুগ্ধ-কুল্যার (কুল্যাল্পা কৃত্রিমা সরিৎ) তুলনা করিয়াছেন, যথা—"স্নপয়সি পয়সীব দুগ্ধ-কুল্যেব দৃষ্টিঃ।"

আকর্ষণার্থ "দুহ্" ধাতু "ক্ত" প্রত্যয় যোগে দুগ্ধ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে (বৈদিককালে) কন্যা সন্তানের উপরেই গোদোহনের ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহাতেই কন্যাকে "দুহিতা" বলা হইত। "দুহ" ধাতু "তৃচ্" প্রত্যয় যোগে "দুহিতৃ" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কন্যা স্নেহময়ী এবং কোমলহৃদয়া, তাহাতেই বৈদিক ঋষিগণ গোবৎসের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া, তাঁহাদের কন্যা সন্তানের উপর গোদোহনের ভার অর্পিত করিয়াছিলেন, ইহাতে গোজাতির প্রতি তাঁহাদের অপরিসীম যত্ন ও স্নেহাধিক্য এবং তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তাই প্রকাশিত হইতেছে।*

(১) ক্ষীর, (২) পয়, (৩) স্তন্য, (৪) বালজীবন, (৫) পীযূষ, (৬) অমৃত, (৭) উধস্য,—এই গুলি দুগ্ধের পর্য্যায় শব্দ। প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় ইহাকে "দুধ" বলা যায়।

[৩]

দুগ্ধের রাসায়নিক গঠন, ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিজ দুগ্ধের রাসায়নিক উপাদানের তুলনা এবং গোদুগ্ধের শ্রেষ্ঠতা।

দুগ্ধের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মত নিম্নে সন্নিবেশিত হইল :—

---

* নিরুক্তকার যাস্কমুনি দুহিতা শব্দের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—"দুহিতা" দুহিতা দূরে হিতা দোগ্ধের্ব্বা। টীকা—দুহিতা সাহি যত্রৈব দীয়তে তত্রৈব দুহিতা ভবতি, দূরে স্থিতা সতী সা পিতু হিতা বাচ্যা ভবতি ইতি দুহিতেত্যচ্যতে দোগ্ধের্ব্বা সাহি নিত্য মেব পিতুঃ সকাশাৎ দ্রব্যং দোগ্ধি প্রার্থনা পরত্বং।

"The chemical constitution of fatty globules [cream] in watery alkaline solution of Casein, and a variety of sugar, peculior to milk, called Lactose is *Milk*. The fat is "*Butter*" "Lactose" constitute the carbonaceous portion of milk, good for food. The "Casein" which forms the principal constetuent of "Cheese" and a certain proportion of "Albumin" which is present forms the Nitrogenous, while the complex saline substances and water are the mineral constetuents. These various substances are present in definite proportion which made milk a typical and perfect food, suitable to the wants of the young of the various animals, for which it is provided by nature."

ইহার তাৎপর্য্য এই যে কেজিনের (Casein অর্থাৎ ছানা), Alkaline [ক্ষারযুক্ত] জলবৎ দ্রব পদার্থে চর্ব্বীযুক্ত [সর] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ এবং Lactose [লেক্‌টোজ] নামক বিবিধ প্রকার শর্করার [যাহা দুগ্ধেরই বিশেষত্ব], রাসায়নিক গঠনকে "দুগ্ধ" বলা যায়। চর্ব্বী (Fat) হইতে নবনীত (মাখন] উৎপন্ন Lactose (লেক্‌টোজ) নামক পদার্থ দুগ্ধের কার্ব্বানিসস্ (আঙ্গারিক) অংশ; ইহা খাদ্যের জন্য প্রশস্ত; Casein

(কেজিন্) এবং দুগ্ধস্থিত অণ্ডাংশ Albumin (এলবুমিন্) অর্থাৎ ডিম্বের অভ্যান্তরস্থ শুভ্রবর্ণ পিচ্ছিল পদার্থ—ইহাকে শ্বেতসার বলা যায়। তাহার (দুগ্ধের) Nitrogenous (নাইট্রোজিনস্) অংশ; জল এবং নানাপ্রকার লবণাক্ত পদার্থ (Saline substances) দুগ্ধের খনিজ অংশ। পূর্ব্বোক্ত বিবিধ পদার্থ নিচয় ভিন্ন ভিন্ন অনুপাত মত দুগ্ধে এরূপ ভাবে মিশ্রিত আছে যে, তাহাতেই ইহা (দুগ্ধ) নানাপ্রকার স্তন্যপায়ী জীব শিশুর পক্ষে (যাহার জন্য প্রকৃতি কর্ত্তৃক ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) সম্পূর্ণ উপযোগী ও উৎকৃষ্ট খাদ্য।

দুগ্ধস্থিত Phosphate of Lime (ফসফেট্ অব লাইম্) হইতে অস্থির (হাড়ের) পোষণ হয়; Soda (সোডা) প্রভৃতি লবণাক্ত পদার্থ হইতে রক্তের তরলত্ব হয় এবং Grastic Juice (গ্রেষ্টিক্ জুস্ অর্থাৎ পরিপাকজনক রস) জন্মে; Casein (ছানা) মাংসবৃদ্ধিকারক, নবনীত মেদবৃদ্ধিকর; অপিচ নবনীত হইতে দুগ্ধের উপাদেয়তা, শর্করা হইতে মিষ্টত্ব, ছানা হইতে গাঢ়তা, জল হইতে তৃপ্তিদায়কত্ব এবং লবণাক্ত দ্রব্যাদি হইতে স্বাদবিশেষ সঞ্জাত হয়।

যে সকল প্রাণিজ দুগ্ধ মানব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের উপাদান সমূহের শতাংশ হিসাবে অনুপাত নিম্নে প্রদর্শিত হইল,—

	গোদুগ্ধ		ছাগদুগ্ধ	মেষদুগ্ধ	অশ্বদুগ্ধ	গর্দ্দভদুগ্ধ	নারীদুগ্ধ
	W.Blyth	Cameron	Vœlcker	Vœlcker	Cameron	Chuallin	Greber
Water জল	৮৬·৮৭	৮৭·০০	Pormilk ৮৪·৪৮ ৮২·০২ Rich	৮৩·৭০ ৮২ ২৭	৯০·৩১০ ৮৮·৮০	৯১·৬৫	৮৮·০২ ৮৮·০০
Casein ছানা Albumen	২·৭৫	৪·১০	৩·৯৪ ৪·৬৭	৫·১৬ ৭·১০	১·৯৫৩ ২·৬১	১·৮২	১·৬০ ২·৯৭
Sugar শর্করা	৪·০০	৪·২৮	৪·৬৮ ৫·২৮	৪·৭৩ ৪·২০	৬·২৮৫ ৫·৫০	৬·০৮	৭·০৩ ৫·৮৭
Fat নবনীত চর্ব্বী	৩·৫০	৪·০০	৬·১১ ৭·০২	৪·৪৫ ৫·৩০	১·০৫৫ ২·৫০	১·০২	২·৯০ ২·৯০
Ash ধাতব পদার্থ	০·৭০	০·৬২	০·৭৯ ১·০১	০·৯৬ ·০০	০·৩৬৯ ০·৫০	০·৩৪	০·৩১ ০·১৬
Peptone পেপটোন্	০·১৭			০·১৩	০·০৯		০·১০

মন্তব্য

ডাক্তার Vœlker বলেন মেষ দুগ্ধের নবনীতের অংশ অত্যন্ত অধিক, ইহা শতাংশে দুই ভাগ হইতে ১২৩ পর্য্যন্ত হইতে পারে।

নিম্নলিখিত পদার্থগুলিও অল্পমাত্রায় দুগ্ধে বর্ত্তমান আছে, যথা—

1 Carbonic Acid Gas কার্ব্বনিক্ এসিড গ্যাস।

2. Sulphuretted Hydrogen সলফিউরেটেড হাইড্রজেন্।

3. Hydrogen হাইড্রজেন।

4. Nitrogen নাইট্রজেন্।

5. Oxygen অক্সজেন্।

6. Galactin গেলেক্টিন্।

7. Lactochrome লেক্টোক্রোম।

মন্তব্য—এই সমস্ত পদার্থের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া দুরূহ, তজ্জন্য তাহা দেওয়া হইল না।

দুগ্ধের জান্তব অংশকে (Animal matterকে) Peptone (পেপ্টোন্) বলা যায়। Dr. W. Blyth (ডাক্তার ডব্লিউ ব্লিথ) বলেন যে, কেজিন্ ও আলবিউমিন্ ব্যতীত নিম্নোক্ত জান্তব পদার্থ সমূহও দুগ্ধে বর্ত্তমান আছে, যথা—

1. Leucin লিউসিন্।

2. Peptone পেপ্টোন।

3. Kreatine ক্রিয়েটিন্।

4. Tyrosin টাইরোসিন্।

মন্তব্য—এগুলিরও বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য সে চেষ্টা করা হইল না।

দুগ্ধে পশ্চাল্লিখিত অনুপাত মত লবণাক্ত ও ধাতব পদার্থ বিদ্যমান আছে, যথা—

পদার্থের নাম…শতাংশ হিসাব অনুপাত

1. Phopheric Acid ফসফেরিক্ এসিড ২৮·৩১
2. Clorine ক্লোরিন্ ১৬·২৪
3. Lime চূণ ২৭·০০
4. Potash পটাস্ ১৭·৩৪
5. Magnasia মেগনেসিয়া ৪·০৭
6. Soda সোডা ১০·০০

রাসায়নিক বিশ্লেষণলব্ধ দুগ্ধের উপাদান সমূহের শতাংশ হিসাবে অনুপাত মতান্তরে কথিত হইয়াছে, তাহার নিম্নে সন্নিবেশিত হইল ;

	নারীদুগ্ধ	গো-দুগ্ধ	গর্দ্দভদুগ্ধ	ছাগদুগ্ধ
Protied (Casein & Lacto albumen) ছানা ইত্যাদি	০·৬ } ১·৪ } ২·০	৩·২৫ } ·৭৫ } ৪·০	১·০ } ·৮ } ১·৮	৩·০ } ০·৭ } ৩·৭
Fat চর্ব্বী (নবনীত)	৩·৫	৩·৫	১·০	৪·২
Sugar শর্করা	৭·০	৪·০	৫·৫	১·০
Mineral matter ধাতব পদার্থ	০·২	০·৭	০·৪	০·৫

মহিষ দুগ্ধে জলীয় ভাগ শতকরা ৮১ হইতে ৮৬ অংশ, চর্ব্বীর ভাগ ৪·৬ হইতে ৬·২ পর্য্যন্ত, ছানা ও এলবিউমিন ৩·৫ হইতে 8 পর্য্যন্ত শর্করা ৫ অংশ, ধাতব ও খনিজ পদার্থ ·৮ অংশ নাইট্রোজেন ৬ অংশ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। Centigrade (সেণ্টিগ্রেড্) স্কেলের তাপমানে ২৫° ডিগ্রী উত্তাপে মহিষ দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) ১·০৩০ হইয়া থাকে।

গো-দুগ্ধের উল্লিখিত উপাদান সমূহের অনুপাত সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বদা এক প্রকার থাকে না; ভিন্ন ভিন্ন গাভীতে এবং একই গাভীতে বিভিন্ন অবস্থায় ও কাল এবং দেশ ভেদে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আহার বিহার, প্রতিপালন, (সন্তান বৎস) কর্ত্তৃক স্তন্য পানের স্থায়িত্ব কাল, প্রকৃতি, বয়স, স্বাস্থ্য ও দোহনের পৌনঃপুন্য ইত্যাদি বিবিধ কারণে দুগ্ধের গুণ ও উপাদানাদির ইতর বিশেষ হয়। প্রাগুক্ত কারণাধীনে দুগ্ধের উপাদানের অনুপাত স্বভাবতঃ নিম্নলিখিতমত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, যথা—

		শতাংশ হিসাবে অনুপাত		
1.	Water জল	৯০·০০	হইতে	৮৩·৬৬
2.	Fat চর্ব্বী	২·১৭	"	৪·৫১
3.	Casein, Albumen ছানা	৩·৩৭	"	৫·৫৫
4.	Sugar শর্করা	৩·১৬	"	৫·৫০
5.	Ash ধাতব পদার্থ	০·৭০	"	০·৮০

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি ও অবগতির জন্য গো-দুগ্ধ ও তজ্জাত পদার্থসমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical Analysis) লব্ধ উপাদান সমূহের শতাংশ হিসাবে অনুপাত নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা—

	Water জল	Fat চৰ্ব্বী	Casein ছানা	Albumin	Sugar শর্করা	Ash ক্ষার
White Milk (খাঁটি দুধ)	৮৭·৬০	৩·৯৮	৩·১২	০·৪০	৪·৭০	০·৭০
Cream সর (মালাই)	৭৭·৩০ *২৮·৬৭৫	১৫·৪৫ ৬৩·০১১	৩ ২০ ৩·৫৩	০·২০ ·৫২১	৩·১৫ ১·৭২৩	০·৭০ ·৪৯
Skimmed Milk (সরতোলা দুধ)	৯০·৩৪ ৯০·১১	১·০০ ·৪৬	২·৮৭ ২·৮৮	০·৪৫ ·৪৯	৪·৬৩ ৫·৪৩	০·৭১ ·৭২
Butter নবনীত (মাখন)	১৪·৮৯ ১৪·১৪	৮২·০২ ৮৩·১১	১·৯৭ ০·৮৬	০·২৮	০·২৮ ০·৭০	০·৫৬ ১·১৯
Butter Milk (মাখনতোলা দুধ)	৯১·০০	০·৪০	৩·৫০	০·২০	৩·৮০	০·৭০
Curd (দধি ছানা)	৫৯·৩০	৬·৪৩	২৪·২২	৩·৫৩	৫·০১	১·৫১
Whey (দই ছাঁকা জল)	৯৪·০০	০·৩৫	০·৪০	০.৪০	৪·৫৫	০·৬০

* প্রত্যেক দ্বিতীয় লাইনের অঙ্কগুলি Winter Blyther এর মতানুযায়ী।

দধির জলকে Whey (হোয়ে) বলা হয়, ইহা হইতেই Milk Sugar (মিল্ক-সুগার) Lactose (অর্থাৎ দুগ্ধ শর্করা) উৎপন্ন হইয়া থাকে ; ইহা দানা বাঁধা ও দৃঢ় হয় এবং জলীয় বাষ্পযোগে সহসা দ্রবীভূত হয় না ; ইহা ইক্ষুজাত শর্করাপেক্ষা কম মিষ্ট হইয়া থাকে।

সাধারণ মন্তব্য ;—স্থূলতঃ দেখা যায় যে নারীদুগ্ধে শতকরা ৩½ হইতে ৪ (চারি) অংশ Nitrogincous (নাইট্রোজেনস্) পদার্থ,—অর্থাৎ Protied (প্রোটিড) [যথা,—Casein (ছানা) Albumin &c. (আল্‌বুমীন্ প্রভৃতি] এবং ৩ (তিন) ভাগ Fat (চর্ব্বী) ৪ (চারি) ভাগ Sugar (শর্করা, ইহাকে Carbo-hydrates (কার্ব্বোহাইড্রেটস্) বলা যায়। এগুলি Organic (অর্গেনিক ; এক ভাগের ¼ চারি অংশ Mineral Matters (ধাতব পদার্থ, খাদ্য) অর্থাৎ Inorganic Substance (ইন্‌অরগেনিক) [যথা—Sodium (সোডিয়ম্), Lime (চূণ) (পটাস) এবং ৮৯ ভাগ জল বর্ত্তমান আছে।

এখন গোদুগ্ধের সহিত এই দুগ্ধের (নারীদুগ্ধের) তুলনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথমোক্তটীতে (গোদুগ্ধে) জলীয় অংশ কম এবং Casein (ছানা) প্রভৃতি সার পদার্থ, Fat (চর্ব্বী), Soda (সোডা), Potash (পটাস) প্রভৃতি লবণাক্ত ক্ষার পদার্থ এবং Nitrogenous (নাট্রোজেন্স) পদার্থ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান; কিন্তু ইহাতে নারীদুগ্ধাপেক্ষা শর্করার অংশ

ন্যূন এবং গোদুগ্ধ ঈষৎ Acid (অম্ল) যুক্ত ও নারী দুগ্ধ Alkaline (ক্ষার) যুক্ত ; এই নিমিত্ত গোদুগ্ধে অল্প পরিমাণ পরিষ্কৃত জল কিছু চূণের জল এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া লইলে ইহা প্রায় নারীদুগ্ধের তুল্য হয়। এই সমস্ত পদার্থ কি পরিমাণে মিশ্রিত করিলে গোদুগ্ধ একবারে নারীদুগ্ধের সমতুল্য হয় তাহা বলা দুষ্কর ; বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবধারণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃ নারীদুগ্ধের অভাবে (মাতৃস্তন্যের অভাবে) গর্দ্দভীদুগ্ধ এবং জল ইত্যাদি মিশ্রিত গোদুগ্ধই প্রশস্ত এবং হিতজনক ; কিন্তু গর্দ্দভীদুগ্ধে সারভাগ ও পুষ্টিকর পদার্থ কম, অতএব আমাদের বিবেচনায় গোদুগ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

(৪)

দুগ্ধের সাধারণ গুণ

(আয়ুর্ব্বেদোক্ত)

দুগ্ধ সাধারণতঃ বলকারক, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক পবিত্র, সুস্বাদু, মসৃণ, স্নিগ্ধ (নবনীত যুক্ত), শীতল ও সারক ; ইহা জীবনীয় পদার্থ সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদোক্ত মতগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ভাব প্রকাশে কথিত হইয়াছে—

"দুগ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং বাতপিত্তহরং সরং।
সদ্যঃ শুক্রকরং শীতং সাত্ম্যং * সর্ব্ব শরীরিণাম্।

* সাত্ম্যং :—অর্থাৎ হিতকারী, সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

জীবনং বৃংহণং বল্যং মেধ্যং বাজীকরং পরম্।

বয়ঃস্থাপনমায়ুষ্যং সন্ধিকারি রসায়নম্।

বিরেকবাস্তিবস্তীনাং তুল্যমোজো বিবর্দ্ধনম্।"

অর্থাৎ—দুগ্ধ সুমধুর, স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত, রসাদি যুক্ত) বায়ুপিত্ত নাশক, সারক (Purgative) সদ্য শুক্রবর্দ্ধক, শীতল, সকল প্রাণীর সাত্ম্য (দেহানুকূল এবং হিত জনক) জীবন রক্ষক, পুষ্টিকর বলকারক, অত্যন্ত বাজীকরণ (রতি শক্তি বর্দ্ধক) বয়ঃ স্থাপক, পরমায়ু বৃদ্ধিকারক, সন্ধি কারক, (ভগ্ন সংযোজক) রসায়ন (জরাব্যাধি বিনাশক) এবং বিরেচন, বমন ও বস্তি ক্রিয়ার (পিচকারী দেওয়ার) উপযোগী, তথা ওজো ধাতুর বর্দ্ধক।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে (বাগ্ভটে) কথিত হইয়াছে :—

"স্বাদু পাকরসং স্নিগ্ধমোজস্যং ধাতুবর্দ্ধনং।

বাতপিত্তহরং বৃষ্যং শ্লেষ্মকং গুরুশীতলম্॥"

প্রায় পয় ... ... অত্র গব্যন্তু

জীবনীয়ং রসায়নম্ "——————"

অর্থাৎ—প্রায় সমস্ত প্রাণিজ দুগ্ধই স্বাদু পাকরস। (জীর্ণ হইয়া রসে পরিণত হয়,) স্নিগ্ধ, ওজোবর্দ্ধক ধাতু পুষ্টিকর,

---

"যো রসঃ কল্পতে যস্য সুখায়ৈব নিসেবিতঃ।

ব্যায়ামজাতমন্যদ্বা তৎ সাত্ম্যমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি যে রস সেবন করিলে, অথবা যে প্রকার ব্যায়াম অথবা অন্য কোনও কার্য্য করিলে তাহার পক্ষে সুখজনক হয়, তাহা তাহার পক্ষে সাত্ম্য বলা যায়; আত্মনো হিতমিতি "আত্মম্" তেন সহ বর্ত্তমানং সাত্ম্যমিতি।

বাতপিত্ত নাশক, বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক) শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, গুরু এবং শীত বীর্য্য ;—তন্মধ্যে গোদুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা জীবনায় (আয়ুবর্দ্ধক) এবং রসায়ন (জরা ব্যাধি বিনাশক)।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

"প্রবরং জীবনীয়ানাং ক্ষীরমুক্তং রসায়নম্।

অর্থাৎ দুগ্ধ জীবনীয় পদার্থ সমূহের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ইহা রসায়ন।

নিঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে : —

"দুগ্ধং ক্ষীরং পয়ঃ স্বাদু রসায়নসমাশ্রয়ং।

সৌম্য প্রস্রবণং স্তন্যং বারি সাত্ম্যঞ্চ জীবিতম্।

তথাহনেকৌষধিরসং স্নিগ্ধং শীতং সূক্ষ্মং সরং মৃদু।

তাৎপর্য্যার্থ—দুগ্ধ (ক্ষীর, স্তন্য পয়ঃ) স্বাদু রসায়ন সৌম্য (পবিত্র) প্রস্রবণ (মূত্রকারক) প্রাণদায়ক সাত্ম্য—অনেকৌষধিরস (অনেক ভুক্ত পদার্থের সার ভাগ), স্নিগ্ধ শীতল সূক্ষ্ম (মসৃণ) সারক ও মৃদু।

অত্রি সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

"স্রোতো বিশুদ্ধিকরণং বলকৃদ্দোষনাশনং।

পয়স্ত্রিদোষনাশনং বৃষ্যঞ্চাগ্নিপ্রবর্দ্ধনম্॥"

অর্থাৎ—দুগ্ধ স্রোতো (দ্বার, ইন্দ্রিয় সমূহের রন্ধ্র পথ) সমূহের বিশুদ্ধি কারক, বলকারক, দোষনাশন (ত্রিদোষ নাশক), বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক) এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

"গব্যমাজং তথা চৌষ্ট্রমাবিকং মাহিষঞ্চযৎ।
অশ্বায়াশ্চৈব নার্য্যাশ্চ করেণুনাঞ্চ যৎপয়ঃ ॥
তত্বানোকৌষধিরস প্রসাদং প্রাণদং গুরু
মধুরং পিচ্ছিলং শীতং স্নিগ্ধ শ্লক্ষ্ণংসরং মৃদু।
সর্ব্ব প্রাণভৃতাং তস্মাৎ ক্ষীরমিহোচ্যতে,
অত্রসর্ব্বমেব ক্ষীরং প্রাণীনাম প্রতিসিদ্ধং জাতি সাত্ম্যাৎ।"

তাৎপর্য্যার্থ :—নানাপ্রকার দুগ্ধ আছে ; তন্মধ্যে গব্য, ছাগী, মেষী, উষ্ট্রী, মহিষী, অশ্বিনা নারী ও হস্তিনী দুগ্ধ ঐ সকল প্রাণীর ভুক্ত নানাপ্রকার ওষধির (তৃণাদির) রসের সার ভাগ। উহাদের দুগ্ধ প্রাণদ, গুরু, মধুর, পিচ্ছিল, শীতল, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ (মসৃণ), সর (সারক) ও মৃদু ; এই সমস্ত কারণে উক্ত সকল প্রকার প্রাণীর জাতিসাত্ম্য (হিতজনক ও দেহানুকূল) বলিয়া এই সকল দুগ্ধ বর্ণিত হইতেছে।

(৫)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত গোদুগ্ধের গুণ।

চরক সংহিতায় গোদুগ্ধের গুণ এই প্রকার কথিত হইয়াছে ; যথা :——

"স্বাদু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং বহলং শ্লক্ষ্ণ পিচ্ছিলং।
গুরু মন্দং প্রসন্নঞ্চ গব্যং দশগুণং পয়ঃ ।
তদেবং গুণমেবৌজঃ সামান্যাদভিবর্দ্ধয়েৎ ॥"

অর্থাৎ—মধুর রস, শীতবীর্য্য, মৃদু, স্নিগ্ধ, ঘন, শ্লক্ষ (সূক্ষ্ম) পিচ্ছিল, গুরু, মন্দ, (অতীক্ষ্ণ) নির্ম্মল- -গব্যদুগ্ধ এই দশ গুণ বিশিষ্ট; ওজঃ পদার্থও এই দশটী গুণান্বিত অতএব গুণতুল্যতা হেতু গোদুগ্ধ ওজো ধাতু বর্দ্ধক। ভাব প্রকাশে কথিত হইয়াছে:—

"গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ
শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাত পিত্তাস্রনাশনম্॥
দোষধাতু মলস্রোতং কিঞ্চিৎ ক্লেদকরং গুরু।
জরাসমস্তরোগানাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা॥

তাৎপর্য্যার্থ:—গোদুগ্ধ বিশেষ (১) মধুর রস ও (২) মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, স্তন্যজনক (দুগ্ধ বর্দ্ধক,) স্নিগ্ধ, বাতপিত্ত নাশক রক্তপিত্ত রোগ নিবারক, দোষ, ধাতু, মল ও স্রোতঃ সমূহের কিঞ্চিৎ ক্লেদজনক, গুরুপাক এবং ইহা নিত্য সেবনে সমস্ত পীড়া প্রশমিত হয়।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে কথিত হইয়াছে—

"——অত্র গব্যস্তু জীবনীয়ং রসায়নম্
ক্ষতক্ষীণহিতং সেব্যং বল্যং স্তন্য করং সবম্॥"

তাৎপর্য্যার্থ:—নানাপ্রকার দুগ্ধের মধ্যে গো-দুগ্ধ জীবনীয়, রসায়ন ক্ষতজনিত ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে হিতকারী; পবিত্র, বল-কারক, স্তন্যকর (দুগ্ধবৃদ্ধিকর) এবং সারক।

সুশ্রুত সংহিতায় কথিত হইয়াছে ;—

"গোক্ষীরমনভিষ্যন্দি স্নিগ্ধং গুরু রসায়নম্।
রক্তপিত্তহরং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ।
জীবনীয়ং তথা বাত পিত্তঘ্নং পরমং স্মৃতম্॥"

অর্থাৎ—গোদুগ্ধ অনভিষ্যন্দী (কফ নিবারক), স্নিগ্ধং গুরু রসায়ন, রক্তপিত্ত নাশক, শীতল মধুর রস এবং মধুর বিপাক,* জীবনীয় এবং অতিশয় রক্তপিত্ত নাশক।

নির্ঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে—

"পথ্যং রসায়নং বল্যং হৃদ্যং মেধ্যং গব্যং পয়ঃ।
আয়ুষ্যং পুংস্ত্বকৃদ্ বাতরক্তপিত্তবিকারনুৎ॥
গব্যং ক্ষীরং পথ্যমত্যন্ত রুচ্যং,
স্বাদু স্নিগ্ধং বাত পিত্তাময়ঘ্নং।
কান্তি প্রজ্ঞা বুদ্ধি মেধাঙ্গপুষ্টিং,
ধত্তে স্পষ্টং বীর্য্যবৃদ্ধিং বিধত্তে॥"

তাৎপর্য্যার্থ—গোদুগ্ধ পথ্য (হিতজনক) বলকারিক, হৃদ্য (তৃপ্তিজনক), মেধ (পবিত্র), আয়ুবর্দ্ধক, পুরুষত্বকারক, বায়ু ও রক্তপিত্ত বিকার নাশক। গোদুগ্ধ পথ্য, অত্যন্ত রুচিকারক,

*বিপাক—দ্রব্য ভক্ষণানন্তরং পাকে সতি—
মাধুর্য্যাদি পরিণামো। জঠরাগ্নিনা যোগাদ্ যদুদেতি রসান্তরং "রসানাং" পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ মিষ্টঃ কটুশ্চ মধুরং অম্লোহম্লং পচ্যতে রসঃ কটু তিক্ত কষায়ানাং পাকঃ স্যাৎ; প্রায়শঃ কটুঃ। মধুরবিপাকস্য শ্লেষ্মাকারিতা অম্লপাকস্য পিত্তকারিতা, বাত শ্লেষ্মা রোগঘ্নতা কটুপাকস্য বাত কফ, পিত্তনাশিতা চ।

স্বাদু, স্নিগ্ধ, বাত-পিত্ত-রোগ-নিবারক, কান্তি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি মেধা ও অঙ্গ পুষ্টিকারক, ইহা স্পষ্টভাবে বীর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

অত্রি সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

"গব্যং পবিত্রঞ্চ রসায়নঞ্চ
পথ্যঞ্চ হৃদ্যং বল পুষ্টিদং স্যাৎ।
আয়ুঃপ্রদং রক্ত বিকার পিত্ত
ত্রিদোষ হৃদ্রোগ বিষাপহং স্যাৎ॥"

বঙ্গার্থ—গোদুগ্ধ, পবিত্র, রসায়ন, পথ্য, হৃদ্য, বল ও পুষ্টি-কারক, আয়ুবর্দ্ধক, রক্তবিকার, পিত্ত ও ত্রিদোষ নাশক এবং ইহা হৃদ্রোগ ও বিষনাশক।

(৬)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত মাহিষ দুগ্ধের গুণ।

চরকোক্ত :—

"মহিষাণাং গুরুতরং গব্যাচ্ছীততরং পয়ঃ।
স্নেহান্যূন মনিদ্রায় হিতমত্যগ্নয়ে চ তৎ॥"

মহিষদুগ্ধ গব্যাপেক্ষা অধিক গুরু ও শীতল এবং স্নেহযুক্ত (নবনীত বিশিষ্ট), অনিদ্রা এবং অত্যগ্নিতে ইহা হিতজনক।

ভাব প্রকাশোক্ত :—

"মাহিষ্যং মধুরং গব্যাৎ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
নিদ্রাকরমভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্যকরং হিমম্॥"

মহিষ দুগ্ধ গোদুগ্ধাপেক্ষা মধুর, স্নিগ্ধ, শুক্রকর এবং গুরু

পাক, ইহা নিদ্রাজনক অভিষ্যন্দী (কফবৰ্দ্ধক), ক্ষুধাধিক্যজনক এবং শীতল।

সুশ্রুতোক্ত :—

"মহাভিষ্যন্দি মধুরং মাহিষং বহ্নিনাশনং।
নিদ্রাকরং শীতকরং গব্যাৎ স্নিগ্ধতরং পয়॥"

অর্থাৎ—মাহিষ দুগ্ধ অত্যন্ত অভিষ্যন্দী (কফবৃদ্ধিকারক), মধুর, অগ্নিনাশক (ক্ষুধা নিবারক) নিদ্রাকর, শীতল এবং গোদুগ্ধ হইতে অধিক স্নেহযুক্ত।

নির্ঘণ্টুক্ত :—

"সৌল্যস্তু মাহিষং ক্ষীরং বিপাকে শীতলং গুরু।
বলপুষ্টি প্রদং বৃষ্যং পিত্ত দাহাস্র নাশনম্॥
শীতং স্নিগ্ধং গুরু সৌলং বৃষং পিত্তাপহং পরং।
জ্ঞেয়াশ্চৈবম্বিধাস্তস্য কিলাটস্তু পয়শ্ছদং॥"

মাহিষ দুগ্ধ "সৌল্য" (মধুর)। ইহা বিপাকে (পরিপাক হইলে) শীতল, গুরু, বল ও পুষ্টিকারক, বৃষ্য (শুক্র বৰ্দ্ধক) পিত্ত দাহ ও রক্ত নাশক, এবং ইহা শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু এবং অত্যন্ত পিত্ত নাশক। মাহিষ দুগ্ধজাত কিলাট ও পয়শ্ছদ (সর) তদ্‌গুণ বিশিষ্ট বলিয়া জানিবে।

মন্তব্য—মাহিষ দুগ্ধ গো দুগ্ধাপেক্ষা যে অধিক স্নেহযুক্ত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে উৎকৃষ্ট ও খাঁটি গোদুগ্ধে /০ এক হইতে /১০ দেড় ছটাকের অধিক নবনীত

(মাখন) হয় না; কিন্তু মাহিষ দুগ্ধে /১০ হইতে ৵০ অর্দ্ধ পোয়া পর্য্যন্ত মাখন উঠিয়া থাকে। কথিত আছে বিলাতী গাভীর দুগ্ধে প্রায় এক পাউণ্ড (অর্দ্ধ সের) মাখন হয়, ইহা কতদূর প্রকৃত বলা যায় না।

এতদ্দেশে দুই প্রকার মহিষ দেখা যায়; এক জাতীয় বাঙ্গড় ও অপরটী কাছড়, নামে কথিত হয়। এতদুভয়ের মধ্যে কাছড়ের দুগ্ধেই অধিক নবনীত হইয়া থাকে। কাছড় মহিষগুলি অতি বৃহৎকায়, উগ্রপ্রকৃতি এবং প্রায় আরণ্য বলিলেও বলা যায়; ইহাদিগকে জঙ্গলাকীর্ণ জলা ভূমি ভিন্ন রাখা দুষ্কর। এতজ্জাতীয় মহিষ সুসঙ্গ, সেরপুর, শ্রীহট্ট ও আসাম প্রদেশের কোনও কোনও স্থানে প্রাপ্য; অন্যত্র কোথাও আছে কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। বাঙ্গড় সর্ব্বত্রই সুলভ। এতদ্ব্যতীত হিসারী (পাঞ্জাব দেশীয়) মহিষগুলি দুগ্ধের জন্য বিখ্যাত। ইহারা ২০। ২৫ সের কি তদপেক্ষাও অধিক দুগ্ধ দিয়া থাকে। বাহুল্য বিবেচনায় মহিষ সম্বন্ধে আর কিছু বলা গেল না। এস্থলে ইহাও ব্যক্তব্য যে, মহিষ দুগ্ধের বর্ণ এবং তজ্জাত নবনীত ও সরের বর্ণ গোদুগ্ধ ও তজ্জাত নবনীত ইত্যাদি হইতে অধিক শুভ্র এবং ইহার সর অতি পুরু হয়।

(৭)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ছাগী দুগ্ধের গুণ।

চরকোক্ত :—

"ছাগং কাষায়ং মধুরং শীতং গ্রাহি পয়োলঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাস জ্বরাপহম্।"

ছাগ দুগ্ধ কষায় রস বিশিষ্ট, মধুর, শীতল, গ্রাহি (মলরোধক), লঘু, রক্ত পিত্ত ও অতিসার নাশক এবং ক্ষয়কাস ও জ্বর নাশক।

ভাব প্রকাশোক্ত—

"ছাগং কষায় মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু।
রক্ত পিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাস জ্বরাপহম্।"

এই অংশের অনুবাদ দেওয়া অনাবশ্যক, কারণ ইহা অবিকল চরকোক্ত মতের ন্যায়।

অপিচ :—

"অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটু তিক্তাদিসেবনাৎ।
স্তোকাম্বুপানাদ্ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগহরং পয়ঃ॥"

ছাগ স্বভাবতঃ অল্পকায় (ক্ষুদ্র দেহ বিশিষ্ট) তদ্ধেতু এবং কটু তিক্তাদি দ্রব্য ভক্ষণ জন্য ও অল্প পরিমাণ জল পান হেতু ইহার দুগ্ধ সর্ব্বরোগনিবারক।

ছাগী দুগ্ধ সম্বন্ধে নিঘণ্টূক্ত মত অবিকল পূর্ব্বোক্তবৎ, অতএব তাহা উদ্ধৃত হইল না।

সুশ্রুতোক্তঃ—

"গব্যতুল্যং গুণস্ত্বাজং বিশেষাচ্ছোষিণাং হিতং।
দীপনং লঘু সংগ্রাহি শ্বাসকাসাস্রপিত্তনুৎ॥"

ছাগ দুগ্ধ গোদুগ্ধের ন্যায় তুল্য গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা শোষ রোগে অত্যন্ত হিতজনক ; ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, সংগ্রাহী মলরোধক), শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত নাশক।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়োক্ত :—

"অল্পাম্বুপান ব্যায়াম কটুতিক্তাশনৈর্লঘু।
আজং শোষ জ্বর শ্বাস রক্তপিত্তাতিসারজিৎ॥"

অর্থাৎ অল্প জল পান হেতু এবং ব্যায়ামশীলতা ও কটুতিক্তাদি দ্রব্য ভক্ষণ জন্য ছাগ দুগ্ধ শোষ, জ্বর, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও অতিসার নাশক।

অত্রিসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"* *
* * * ত্রিদোষঘ্নঞ্চ,
ক্ষীণাজদুগ্ধং গোদুগ্ধবীর্য্যাদধিক গুণং, ক্ষীণদেহেষু
পথ্যতমঞ্চ ; স্থূলকায়াজ দুগ্ধং গুণৈঃ কিঞ্চিদূনম্।"

ছাগ দুগ্ধ ত্রিদোষ নাশক ; ক্ষীণকায় ছাগ দুগ্ধ—গোদুগ্ধ বীর্য্য (দ্রব্যশক্তিকে বীর্য্য বলা যায়) অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট এবং ইহা ক্ষীণকায় ব্যক্তির পক্ষে পথ্যতম (হিতজনক)। স্থূলকায় ছাগ-দুগ্ধ কিঞ্চিৎ অল্প গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

মন্তব্য—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, গোদুগ্ধাপেক্ষা ছাগ দুগ্ধে লবণাক্ত পদার্থ ও ছানার ভাগ অধিক ; তথাপি হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ এবং যাহাদের পরিপাক-শক্তি প্রবল এবংবিধ বালকের পক্ষে ইহা বিশেষ হিতজনক। যে ছাগীর দুগ্ধ ব্যবহার করাইতে হইবে তাহাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিলে তাহার দুগ্ধ দ্বিগুণ-বিশিষ্ট হয়। কারণ ছাগ অতিশয় যথেচ্ছভোক্তা। অতএব তাহাকে বাঁধিয়া খাওয়ানই উচিত।

(৮)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত নারী দুগ্ধের গুণ।

চরকোক্ত—

"জীবনং বৃংহণং সাত্ম্যং স্নেহনং মানুষং পয়ঃ।
লাবণং রক্তপিত্তেচ তর্পণং চক্ষুশূলিনাম্॥"

নারীদুগ্ধ জীবন, হিত, বৃংহণ (বলকারক), সাত্ম্য (দেহানুকূল) ও স্নিগ্ধতাকারক। রক্তপিত্তে ইহার নস্য এবং চক্ষু শূলে ইহার তর্পণ (অঞ্জন) হিতজনক।

ভাবপ্রকাশোক্ত :—

"নার্য্যা লঘু পয়ঃ শীতং দীপনং বাতপিত্তজিৎ।
চক্ষুশূলাভিঘাতঘ্নং নস্যাশ্চোতনয়োর্ব্বরম্॥"

নারী দুগ্ধ লঘু, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত, পিত্ত বিনাশক। ইহা চক্ষুশূল ও অভিঘাত নাশক এবং নস্য ও আশ্চোতনে (নেত্রাঞ্জনে) শ্রেষ্ঠ।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়োক্ত :—

"মানুষং বাতপিত্তাসৃগভিঘাতাক্ষিরোগনুৎ।
তর্পণাশ্চোতনৈর্ণস্যৈঃ * * ॥"

নারী দুগ্ধের তর্পণ (নেত্রপূরণ) আশ্চোতন (অঞ্জন) ও নস্য দ্বারা বাত পিত্ত, রক্ত বিকার অভিঘাত এবং চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

নিঘণ্টুক্তঃ—

"স্নিগ্ধং স্থৈর্য্যকরং চাপি চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্।
জীবনং বৃংহণং সাত্ম্যং স্নেহনং মানুষী পয়ঃ॥
নাশনং রক্তপিত্তেচ তর্পণং চাক্ষিশূলহৃৎ।
মধুরং মানুষী ক্ষীরং কষায়ঞ্চ হিমং লঘু।
চক্ষুষ্যং দীপনং পথ্যং পাচনং রোচনঞ্চ তৎ॥"

অর্থাৎ—নারী দুগ্ধ স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকর (দেহের দৃঢ়তা সম্পাদক চক্ষুষ্য (চক্ষের হিতকর), বলকারক, জীবন হিত, বৃংহন (শুক্রবর্দ্ধক), সাত্ম্য, স্নেহন [চাকচিক্য কারক], রক্তপিত্ত নাশক এবং ইহার তর্পণে চক্ষুশূল নাশ করে। নারী দুগ্ধ কষায়, হিম লঘু, চক্ষুষ্য, দীপন (অগ্নিবর্দ্ধক), পথ্য (হিতকর,) পাচন (পরিপাককারক) ও রুচিজনক।

যে সকল প্রাণিজ দুগ্ধ মানবের ব্যবহার্য্য তৎসমস্তের বিষয়ই বলা হইল, অধুনা অশ্বিনী, গর্দ্দভী ও অন্যান্য এক ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণী (অখণ্ডিত ক্ষুরযুক্ত প্রাণী) উষ্ট্রী, মেষী ও হস্তিনী দুগ্ধের আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণাদি ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইল।

(৯)

অশ্ব, গর্দ্দভ ও অন্যান্য এক ক্ষুরযুক্ত প্রাণিজ দুগ্ধের গুণ :

(আয়ুর্ব্বেদোক্ত)

অষ্টাঙ্গ হৃদয়োক্ত :—

"বাঢ়মুষ্ণং তৈ্বকশফং লঘু, শাখাবাতহরং জড়তাকরং
পয়োহভিষ্যন্দি গুর্ব্বানং যুক্ত্যাশৃতমতোহন্যথা।"

অশ্বাদি এক ক্ষুরযুক্ত প্রাণিজ দুগ্ধঅত্যন্ত উষ্ণ বীর্য্য, লঘু, শাখা-বাত (বাহু প্রভৃতির বাত), নাশক অম্ল লবণাক্ত স্বাদ বিশিষ্ট, জড়তাকারক ও অভিষ্যন্দী (কফকারক)। এ সমুদয় অপক্কাবস্থায় (কাঁচা অবস্থায়) গুরু কিন্তু উপযুক্তরূপে জ্বাল দিয়া নিলে তাহার অন্যথা হয় (লঘু হয়)।

ভাব প্রকাশোক্ত:—

"রুক্ষোষ্ণং বড়বা ক্ষীরং বল্যং শোষানি লোপহং।
অম্লং কটু লঘু স্বাদু সর্ব্বমৈকশফং তথা॥"

অশ্ব দুগ্ধ বলকারক রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, শোষ ও বায়ুনাশক অম্ল ও কটু স্বাদবিশিষ্ট, লঘু ও স্বাদু। অন্যান্য এক ক্ষুরবিশিষ্ট সমস্ত প্রাণিজ দুগ্ধ এই প্রকার জানিবে।

নিঘণ্টূক্ত :—

"অশ্বক্ষীরং বৃষ্যাম্লং দীপনং লঘু।
দেহ স্থৈর্য্যকরং বল্যং গৌরবকান্তিকৃৎপয়ঃ।
শাখাবাতহরং সাম্লঞ্চ রুচিং দীপ্তিকৃৎ॥"

অশ্বক্ষীর বৃষ্য (বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক), অম্লস্বাদযুক্ত, দীপন (অগ্নি-বর্দ্ধক) লঘু, দেহের স্থৈর্য্যকারক, বল্য (বলকারক) গৌরব ও কান্তি বৃদ্ধিকর, শাখা বাতনাশক এবং রুচি ও দেহের দীপ্তিকারক।

নিঘণ্টূক্ত গর্দ্দভী দুগ্ধের গুণং :—

"কাসশ্বাসহরং ক্ষীরং গার্দ্দভং বালরোগনুৎ।
মধুরাম্লরসং রক্ষং লবণানুরসং লঘু॥
বলকৃদ্ গর্দ্দভীক্ষীরং বাতশ্বাসহরং পরং।
মধুরাম্লরসং রুক্ষং দীপনং পথ্যদং স্মৃতম্॥"

গর্দ্দভী দুগ্ধ কাস ও শ্বাস নাশক, ইহা বালরোগ (শিশুদের পীড়া) নাশক; মধুরাম্ল রস, রুক্ষ, লবণানুরস, গুরু, বলকারক, অত্যন্ত বায়ু ও শ্বাস নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং পথ্যদ (হিতজনক) বলিয়া জানিবে।

সুশ্রুতোক্ত :—

"উষ্ণঞ্চৈকশফং বল্যং শাখাবাতহরং পয়ঃ।
মধুরাম্লরসং রুক্ষং লবণানুরসং লঘু॥"

এক ক্ষুর বিশিষ্ট প্রাণিজ (অশ্বাদির) দুগ্ধ বলকারক, শাখা বাত নাশক, মধুরাম্ল ও লবণানুরস, রুক্ষ এবং লঘু।

(১০)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত উষ্ট্রী দুগ্ধের গুণ।

ভাবপ্রকাশোক্ত :—

"ঔষ্ট্রং দুগ্ধং লঘু স্বাদু লবণং দীপনং তথা।
ক্রিমিকুষ্ঠ কফানাহ শোথোদরহরং পয়ঃ॥"

"ঔষ্ট্র দুগ্ধ, লঘু, স্বাদু, লবণ রস, অগ্নিবৃদ্ধিকর, এবং ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ (কোষ্ঠবদ্ধ রোগ) শোথ ও উদরী রোগ নিবারক।

চরকোক্ত :—

"রুক্ষোষ্ণং ক্ষীরমুষ্ট্রীনামীষৎ সলবণং লঘু।
শাস্তং বাতকফানাহ কৃমিশোথোদরার্শসাম্॥"

উষ্ট্রী দুগ্ধ—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ লবণ স্বাদযুক্ত, লঘু, বাত, কফ, আনাহ, ক্রিমি, শোথ, উদর ও অর্শরোগে প্রশস্ত।

নিঘণ্টূক্ত :—

"উষ্ট্রীক্ষীরং কুষ্ঠশোফহরং তৎপিত্তার্শঘ্নং তৎকফাটোপহারি।
আনাহার্ত্তি জন্তু গুল্মোদরাণাং শ্বাসোল্লাসং নাশয়ত্যাশু পীতম্॥"

উষ্ট্রী দুগ্ধ কুষ্ঠ ও শোথ নাশক। ইহা কফ আটোপ (বাত জন্য উদর স্ফীতি), আনাহ (কোষ্ঠবদ্ধ) গুল্ম ও উদরী নাশক।

(১১)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত মেষী দুগ্ধের গুণ।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়োক্ত :—

"* * * অহৃদ্যং তৃষ্ণমাবিকম্
বাতব্যাধিহরং হিক্কা শ্বাস পিত্ত কফপ্রদম্॥"

মেষ দুগ্ধ অহৃদ্য (মুখ রুচিকারক নহে) ও উষ্ণবার্য্য। ইহা বাতব্যাধি নাশক; হিক্কা, শ্বাস, পিত্ত ও কফপ্রদ।

নিঘণ্টূক্ত :—

"অবিকন্তু পয়ঃ স্নিগ্ধং কফপিত্তহরং পরং।
স্থৌল্যং মেহহরং পথ্যং লোমশং গুরুবৃদ্ধিদম্॥
ঔরভ্রং মধুরং স্নিগ্ধমুষ্ণং তিক্তং কফাপহং।
গুরু শুদ্ধানিলে পথ্যং শোফে চানিলে শোনিতে"

অর্থাৎ—মেষ দুগ্ধ স্নিগ্ধ, অত্যন্ত কফ ও পিত্ত নাশক, মেহ নাশক পথ্য (হিতজনক), লোমশ (রোম বৃদ্ধিকর), গুরু এবং বৃদ্ধিদ (স্থূলতাকারক)।

ইহা (মেষ দুগ্ধ) মধুর, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, তিক্ত ও কফনাশক, গুরু এবং ইহা কেবল বায়ু রোগে এবং বায়ু ও রক্তজনিত শোফে হিতজনক।

ভাবপ্রকাশোক্ত :—

"আবিকং লবণং লঘু স্নিগ্ধোষ্ণঞ্চাশ্মরীপ্রনুৎ।
অহৃদ্যং তর্পণং কেশ্যং শুক্রপিত্তকফপ্রদম্।
গুরু কাসেহনিলোদ্ভূতে কেবলে চানিলে বরম্॥"

মেষ দুগ্ধ লবণ স্বাদযুক্ত, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং অশ্মরী রোগ (পাথুরী Stone) নাশক, ইহা অহৃদ্য (রুচিকর নহে), তর্পণ (তৃপ্তিদায়ক), কেশ বৃদ্ধিকারক, শুক্র, পিত্ত ও কফ বর্দ্ধক এবং গুরু ও বায়ুজাত কাসরোগে এবং কেবল বায়ুরোগে শ্রেষ্ঠ।

(১২)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত হস্তিনী দুগ্ধের গুণ

চরকোক্ত :—

"হস্তিনীনাং পয়ো বল্যং গুরু স্থৈর্য্যকরং পরম্"

হস্তিনী দুগ্ধ বলকারক, গুরু ও অত্যন্ত স্থৈর্য্যকর (শরীরের দৃঢ়তাকারক)।

নিঘণ্টূক্ত :—

"হস্তিন্যা মধুরং কষায়ানুরসং গুরু।
স্নিগ্ধং শীতকরঞ্চাপি চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্॥"

অর্থাৎ—হস্তিনী দুগ্ধ মধুর, বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক) কষায়ানুরস, গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, চক্ষুষ্য ও বলবর্দ্ধক।

সুশ্রুত ও ভাব প্রকাশোক্ত হস্তিনী দুগ্ধ গুণও উক্ত প্রকার কথিত হইয়াছে, অতএব তাহা উদ্ধৃত হইল না।

(১৩)

আয়ুর্ব্বেদোক্ত অরণ্য মৃগী দুগ্ধের গুণ।

ভাব প্রকাশোক্ত :—

"মৃগীনাং জঙ্গলোত্থানামজাক্ষীরসমং পয়ঃ"

সমস্ত আরণ্য মৃগী দুগ্ধের গুণ ছাগ দুগ্ধের তুল্য (ছাগ দুগ্ধের গুণ দ্রষ্টব্য)।

মন্তব্য :—আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের দুগ্ধের গুণাদি নাতি-বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইল। অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, অবস্থা, কাল, দেশ ও পাত্রাদি ভেদে নানাপ্রকার প্রাণিজ দুগ্ধ মানবের পক্ষে হিতজনক হইলেও, সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা গো-দুগ্ধেই শ্রেষ্ঠ ও হিতজনক। বলা বাহুল্য যে, শিশুর পক্ষে মাতৃ দুগ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তদভাবে গো, ছাগ ও গর্দ্দভী দুগ্ধই তাহার পক্ষে পথ্যতম, তাহাতে সন্দেহ নাই ; এ বিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে কথিত হইয়াছে যে ;—

'আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।

রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ"

আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধক এবং রসযুক্ত স্নিগ্ধ স্থিরতা সম্পাদক, হৃদ্য (রুচিকর) আহারাদিই সাত্ত্বিক লোকের প্রিয়।

অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, দুগ্ধ (বিশেষতঃ গো-দুগ্ধ) এবং তজ্জাত পদার্থ নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সাত্বিক প্রিয় আহার। গো জাতির অপরিসীম উপকারিতা সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারিয়াই, আর্য্য মহর্ষিগণ তাহার রক্ষা, পালন ও উন্নতিকল্পে বিবিধ সুনিয়ম প্রচারিত করিয়া গিয়াছিলেন, অধুনা সেগুলির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আমরা ক্রমশঃ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছি। এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে।

(১৫)

গাভীর বর্ণভেদে দুগ্ধের গুণাদির তারতম্য।

গাভীর বর্ণভেদে দুগ্ধের গুণাদির অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এতৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত এই যে, রক্তবর্ণা গাভীর দুগ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ তাহার আহার্য্য অতি সহজে জীর্ণ [illegible] শ্বেত কৃষ্ণ মিশ্রিত (কাজলা) বর্ণের গাভীর দুগ্ধ নিকৃষ্ট এবং পরিমাণেও অল্প হইয়া থাকে; ইহাতে নবনীতের ভাগও কম থাকে। সরের ন্যায় (Creamy Colour) শুভ্রবর্ণা গাভীর যদি রোম মসৃণ হয় এবং তাহার চর্ম্ম ও ক্ষুর এবং কর্ণাভ্যন্তরভাগ হরিদ্রাভ হয় তবে সে অধিক দুগ্ধবতী হয়, এবং তাহার দুগ্ধে নবনীত ও ছানা ইত্যাদি অধিক থাকে। কেবল শ্বেত বর্ণা গাভীর দুগ্ধ ভাল নয় এবং তাহার দুগ্ধের পরিমাণও অল্প হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, গাভীর বর্ণদ্বারা দুগ্ধের গুণাদি

নিরূপিত হওয়া দুরূহ ; তবে তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বিলাতী রক্তবর্ণা এবং ভারতবর্ষীয় কৃষ্ণা গাভীর দুগ্ধ উৎকৃষ্ট। এখন দেখা যাউক, এ বিষয়ে আর্য্য ঋষিগণের মত কি ? বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে তাঁহারা এতাদৃশ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা এবং গভীর অনুসন্ধিৎসারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে :—

"কৃষ্ণায়া গোর্ভবেদ্দুগ্ধং বাতহারিগুণাধিকং।
সীতায়া হরতে পিত্তং তথা বাতহরং ভবেৎ।
শ্লেষ্মলং গুরু শুক্লায়া রক্তা চিত্রাচ বাতহৃৎ।"

কৃষ্ণা গাভীর দুগ্ধ বাতনাশক, এবং অধিক গুণ বিশিষ্ট (পাশ্চাত্য মনের সহিত এই মতের ঐক্য আছে), পীতবর্ণা গাভীর দুগ্ধ পিত্তনাশক শুক্লা গাভীর দুগ্ধ গুরু ও শ্লেষ্মা বর্দ্ধক (পাশ্চাত্য মতটীও এই মতের পোষক বলিয়াই বোধ হয়), রক্তবর্ণা ও চিত্রা (বিবিধ বর্ণ মিশ্রত) গাভীর দুগ্ধ বায়ুনাশক। চরকোক্ত মত "আহার্য্য পদার্থের সহিত গোদুগ্ধের গুণাদির ইতর বিশেষ" শীর্ষক প্রবন্ধ (১৬শ প্রবন্ধ) দ্রষ্টবা।

অত্রিসংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

"অত্র শ্বেত দুগ্ধং শ্লেষ্মাকরং রক্তায়া বাতলং
পীতায়া পিত্তসংশমনং বিশিষ্টং কৃষ্ণায়াশ্চ পিত্তঘ্নম্।"

অর্থাৎ—(গাভীর বর্ণভেদে দুগ্ধের গুণ ভেদ হয) তন্মধ্যে —শ্বেতবর্ণার দুগ্ধ শ্লেষ্মকর, রক্তাব বায়ুবর্দ্ধক, পীতবর্ণার পিত্ত নাশক এবং কৃষ্ণা গাভীর দুগ্ধ বিশিষ্ট (বিশেষ গুণ বিশিষ্ট) এবং পিত্ত বর্দ্ধক।

নির্ঘণ্টুতে কথিত হইযাছে :—

গবাং সিতানাং বাতঘ্নং কৃষ্ণানাং পিত্তনাশনম্

বাতঘ্নং রক্তবর্ণানাং ত্রীন হান্ত কপিলা পযঃ ॥”

পাঠান্তর : –

“বাতঘ্নং রক্তবর্ণানাং গোদুগ্ধঞ্চ ত্রিধা ভবেৎ।”

শুক্লবর্ণা গাভীর দুগ্ধ বাতঘ্ন, কৃষ্ণায দুগ্ধ পিত্তনাশক, রক্তবর্ণার বাতঘ্ন এবং কপিলার দুগ্ধ ত্রিদোষ নাশক।

(পাঠান্তর :—গোদুগ্ধ ত্রিদোষ নাশক।)

আমাদের শাস্ত্রে একাদশ প্রকার কপিলার বিষয় কথিত হইয়াছে ; যথা (১) সুবর্ণ কপিলা, (২) গৌর পিঙ্গলা, (৩) রক্তাক্ষা (৪) গুড় পিঙ্গল, (৫) বহুবর্ণা, (৬) শ্বেত পিঙ্গলা, (৭) শ্বেত পিঙ্গলাক্ষী, (৮) কৃষ্ণ পিঙ্গলা, (৯) পাটলা, (১০) পুচ্ছ পিঙ্গলা, (১১) ক্ষুর শ্বেতা। এই একাদশ প্রকার কপিলার প্রত্যেকের দুগ্ধে গুণাদির পার্থক্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে কিনা তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বস্তুতঃ শাস্ত্রে কপিলা গাভীর অত্যন্ত প্রশংসা ও তাহার দানাদিতে বিশেষ ফলাধিক্য কথিত হইয়াছে। কুতূহলী পাঠকবৃন্দ এ বিষয় শাস্ত্রোক্ত মত পাঠ করিলেই সবিশেষ জানিতে

পারিবেন। অতএব এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে কিছু বলা হইল না।

অন্যত্র কথিত হইয়াছে।:—

"বৎসৈকবর্ণয়োঃ শস্তঃ ধবলীকৃষ্ণয়োর্বাপি।"

ধবলী ও কৃষ্ণা গাভীর বৎসও যদি তত্তৎ বর্ণযুক্ত হয় (অর্থাৎ ধবলীর ধবল বৎস এবং কৃষ্ণার কৃষ্ণাবর্ণ বৎস হয়) তবে তাহাদের দুগ্ধ শ্রেষ্ঠ হইযা থাকে।

উপরোক্ত মত গুলির মধ্যে পরস্পর কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও, স্থূলতঃ প্রায় একই প্রকার। অবস্থা ও প্রয়োজন বিবেচনায় গাভীর বর্ণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দুগ্ধ ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা সর্ব্বাবস্থায় সম্ভবপর নহে।

(১৫)

দেশ ও জাতিভেদে গো-দুগ্ধের গুণাদির ইতর বিশেষ।

দেশভেদে ও গাভীর জাতিভেদে দুগ্ধের গুণ ও পরিমাণের অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়, এক জাতীয় গাভীরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দুগ্ধের গুণাদির ইতর বিশেষ হইযা থাকে। ভারতবর্ষীয় গাভীর মধ্যে (১) হিসারী (পাঞ্জাব দেশীয়), (২) কাটেবারী (গুজরাট ও কচ্ছ দেশীয়), (৩) মেলোরী (মান্দ্রাজ দেশীয়), (৪) গুব্‌গুবিয় (মুলতান দেশীয়) এবং (৫) নাগোরী (নাগপুর ও মধ্য ভারতের) গাভী উৎকৃষ্ট; এ গুলির মধ্যে আবার "হিসারী ও কাটেবারী" গাভীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদের এক একটী গাভী

৮০ তোলা পরিমাণ সেরের ১০ হইতে ১৫। ১৬ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে; ইহাদের দুগ্ধ সুস্বাদু এবং সদ্‌গুণ বিশিষ্ট।

বিলাতী গাভী নানা জাতীয় তন্মধ্যে (1) Short horn, (2) Ayrshire. (3) Jersy, (4) Alserney, (5) Garensey (6) Devon, (7) Kerry, (8) Devte kerry, (9) Welsh-

এই কয়টীই উৎকৃষ্ট জাতীয়। ইহাদের এক একটী উৎকৃষ্ট গাভী ১৫। ১৬ সের হইতে অর্দ্ধমণ কি ২৫ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। এ কথা আপনাদের ধারণার অতীত হইতে পারে, কিন্তু ইহা অকাট্য সত্য। এই ভারতবর্ষেও এক সময়ে (যখন ইহা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর লীলা নিকেতন ছিল) দ্রোণদুগ্ধা (৩২ সের দুগ্ধ দাত্রী) গাভী বর্ত্তমান ছিল; "কিন্তু তে হি নো দিবসা গতাঃ" এক্ষ বঙ্গদেশে ৩২ সের দূরের কথা ৩২ তোলা দুগ্ধবতী গাভীই দুর্লভ বলা যায়। আমাদের দেশ এমনই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে; ক্রমশঃ অবস্থা আরও কত দূরে গিয়া দাঁড়াইবে কে বলিতে পারে। ভারতবর্ষের ন্যায় "সুজলা, সুফলা এবং শস্যশ্যামলা" দেশে চেষ্টা করিলে এখনও দ্রোণদুগ্ধা না হউক অন্ততঃ ২০। ২২ সের দুগ্ধবতী গাভী উৎপন্ন হইতে পারে। "যত্নেন কিমসাধ্যম্" এ কথা মনে রাখিয়া গো-জাতির উন্নতি বিষয়ে দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই মনোযোগী হওয়া উচিত।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশজাত গাভী অপেক্ষা শীত প্রধান দেশীয় গাভীর দুগ্ধে অধিক নবনীত ও ছানা থাকে।

নিম্নদেশে ও জলাকীর্ণ ভূমিতে বিচরণশীলা গাভীর দুগ্ধে জলীয়ভাগ অধিক ও নবনীত এবং শর্করার ভাগ কম থাকে। কিন্তু উচ্চ ও শুষ্ক ভূমি এবং পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে বিচরণ শীলা গাভীর দুগ্ধে জলীয়ভাগ কম থাকে এবং পূর্ব্ব কথিত উপাদানগুলি (নবনীত ও ছানা প্রভৃতি) অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান থাকে।

এ বিষয়ে ভাব প্রকাশে কথিত হইয়াছে

"জঙ্গালানূপশৈলানাং চরন্তীনাং যথোত্তরং।

পয়ো গুরুতরং স্নেহো যথাহারং প্রবর্ত্ততে॥"

জঙ্গলাকীর্ণ, অনূপ (জল বহুল) স্থানে ও পার্ব্বত্য দেশে বিচরণকারী গাভীর দুগ্ধ যথাক্রমে গুরু ও স্নিগ্ধ (আহারানুযায়ী) হইয়া থাকে।

নির্ঘন্টুতে কথিত হইয়াছে,—

"জঙ্গলাম্বুপদেশেষু পারন্তীনাং যথোত্তরং।

পয়ো গুরুতরং স্নেহো যথা চৈষাং বিবর্দ্ধতে॥"

এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য পূর্ব্বোক্ত শ্লোকেরই অনুরূপ, অতএব বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল না।

"কৈশ্চিদুক্তা বিশেষাচ্চ বিশেষ দেশভেদতঃ"

উক্তঞ্চ—দেশেষু দেশেষু চ তেষু তেষু তৃণাম্বুনী যাদৃশ দোষ যুক্তে—তৎসেবনাদেব গবাদিকানাং গুণাদি দুগ্ধাদিষু—

তাদৃশং মতম—

অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন দেশ ভেদে বিশেষতঃ দুগ্ধের বিশেষত্ব হয ; কথিত হইযাছে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে তৃণ ও জলাদি যাদৃশ দোষযুক্ত, তাহা সেবনে গবাদির দুগ্ধে তাদৃশ গুণাদি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

আহার্য্য পদার্থের সহিত গো-দুগ্ধের গুণাদির সম্বন্ধ বিচার।

স্তন্যপাযী স্ত্রী জাতীয প্রাণী সমূহের ভুক্ত পদার্থই পরিণামে দুগ্ধরূপে পরিণত হয় ; এ বিষযে সুশ্রুতোক্ত মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইযাছে, তথাপি প্রসঙ্গাধীন এখানেও তাহা সন্নিবেশিত হইল।

"রস প্রসাদো মধুরঃ পক্কাহার নিমিত্তজঃ।
কৃৎস্নদেহাৎ স্তনৌ প্রাপ্তঃ স্তন্য মিত্যভিধীয়তে॥"

অতএব আহার্য্য পদার্থের গুণভেদে গবাদির দুগ্ধের গুণবৈষম্য জন্মানই স্বাভাবিক এবং প্রকৃত প্রস্তাবে হইয়াও থাকে তাহাই। কথিত আছে, কাশ্মীর দেশীয গাভী তদ্দেশজাত সুবিখ্যাত এবং সুগন্ধী কুঙ্কুমরেণু (জাফরান্) ভক্ষণ করিযা যে দুগ্ধ দেয তাহা তদ গন্ধযুক্ত হয। পেঁয়াজ, রসুন, গাজর, শালগম্ প্রভৃতি উগ্রগন্ধী দ্রব্যাদি ভক্ষণে গো-দুগ্ধ উগ্রগন্ধী হইযা যায, ইহা প্রত্যক্ষ। সাধারণতঃ জলাভূমিতে বিচরণশীলা গাভীর দুগ্ধ তরল ও জলীয স্বাদ বিশিষ্ট হয় এবং তাহাতে নবনীত ও শর্করার ভাগ কম থাকে, কিন্তু উচ্চ ও শুষ্ক ভূমিতে যে সমুদয গাভী চরিয়া বেড়ায ও তৃণাদি ভক্ষণ করে তাহাদের দুগ্ধ গাঢ় ও সুস্বাদু হয় এবং তাহাতে নবনীত প্রভৃতি

সার পদার্থ অধিক থাকে। পরিষ্কার কাঁচা ঘাস খাইলে গাভীর দুগ্ধ সুস্বাদু হয় এবং দুগ্ধের বর্ণও পরিষ্কার হয়। তূলার বীজ আহারে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতে নবনীত প্রভৃতি অধিক হয়। গম, যব প্রভৃতির ভূষিতে দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণাদি বৃদ্ধি হয়। সর্ষপ খোল অপেক্ষা তিসি ও তিলের খোলে দুগ্ধের স্বাদ ভাল হয় এবং তাহার পরিমাণ গুণাদিও বৃদ্ধি পায়, সর্ষপ খোলে গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়। মাষপর্ণী (মাষাণী) অথবা মাষ কলায়ের ডাল পাতা প্রভৃতি ও ইক্ষু (আক) খাইলে গো-দুগ্ধ বাড়িয়া থাকে এবং দুগ্ধের স্বাদ ভাল হয়।

আয়ুর্ব্বেদে কথিত হইয়াছে,—

"ইক্ষ্বাদা মাসপর্ণ্যাদাউর্দ্ধশৃঙ্গী চ যা ভবেৎ।
তাসাং গবাং হিতং ক্ষীরম———"

ইক্ষু ও মাষপর্ণ ভক্ষণশীলা ও উর্দ্ধশৃঙ্গী গাভীর দুগ্ধ হিতজনক। কচুর ডাঁটা জলে সিদ্ধ করিয়া গাভীকে খাওয়াইলে তাহার দুগ্ধ লাল ও পাতলা হয়, নিম্ব গুলঞ্চ এবং বাব্‌লার ফল খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধে দুর্গন্ধ হয়, নটেশাক খাওয়াইলে দুগ্ধ সুস্বাদু হয়।

এ বিষয়ে নির্ঘণ্টূক্ত মত পূর্ব্ব প্রস্তাবে (১৫শ প্রস্তাবে) উদ্ধৃত হইয়াছে;—অতএব এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক।

আরও কথিত হইয়াছে যে;—

"পিণ্যাকাম্লাশিনীনাঞ্চ গুর্ব্বভিষ্যন্দি তদ্‌ভৃশম।"

অর্থাৎ—পিন্যাক (তিল কল্ক, তি'লের খোল) এবং অম্ল স্বাদ বিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণে গাভীর দুগ্ধ অত্যন্ত গুরু ও অভিষ্যন্দী (কফ বৰ্দ্ধক) হয়।

রাজনির্ঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে ;—

"খল্বম্লভক্ষণাজ্জাতং ক্ষীরং গুরু কফপ্রদং।

তত্তু বল্যং পরং বৃষ্যং স্বস্থানাং গুণদায়কম্॥

অম্ল ভক্ষণজাত গো-দুগ্ধ গুরু এবং কফ প্রদ হইয়া থাকে ; কিন্তু ইহা বলকারক এবং অত্যন্ত বৃষ্য (শুক্র বৰ্দ্ধক) ও সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে গুণদায়ক।

চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে ;—

"মাষপর্ণভৃতাং ধেনুং গৃষ্টিং পুষ্টাং চতুস্তনাং।

সমানবর্ণবৎসাঞ্চ জীববৎসাঞ্চ বুদ্ধিমান্॥

রোহিণীমথবা কৃষ্ণামূৰ্দ্ধশৃঙ্গা মদারুণাং।

ইক্ষু্বা মার্জ্জণাদাং বা সান্দ্রক্ষীরাঞ্চ ধাবয়েৎ॥

কেবলস্তু পয়স্তস্যাঃ শৃতং বাঽশৃতমেব বা।

শর্করা মধু সর্পির্ভির্যুক্তং তদ্ বৃষ্যমুত্তমম্॥"

অর্থাৎ—বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাষপর্ণভক্ষণকারিণী একবার মাত্র প্রসূতা (গৃষ্টি), পুষ্টা (সবল দেহ বিশিষ্টা) সমান বৎসবর্ণা (যে গাভীর বৎস মাতৃবর্ণ বিশিষ্ট), জীববৎসা (যাহার বৎস জীবিত আছে), রোহিণী (রক্ত বর্ণা) অথবা কৃষ্ণা, উৰ্দ্ধশৃঙ্গা অদারুণা (শান্ত স্বভাব বিশিষ্টা), ইক্ষু (আক) ও অর্জ্জুন

বৃক্ষ ভক্ষণ কারিণী, সান্দ্রক্ষীরা (যাহার দুগ্ধ গাঢ়) গাভী পালন করিবেন। উপরোক্ত প্রকার গাভীর দুধ অন্য দ্রব্যাদি যোগ করিয়া অথবা শর্করা, মধু ও ঘৃত যুক্ত করিয়া শৃত (জ্বাল দেওয়া) বা অশৃত (ঠাণ্ডা) অবস্থায় পান করিলে তাহা অতিশয় বলকারক হয়।

মন্তব্য—ব্যাখ্যাত শ্লোকটী কেবল আহার্য্য পদার্থের গুণ-বিচারমূলক নহে, ইহাতে অন্যান্য বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে, সে গুলি অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সম্পূর্ণভাবেই উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল।

(১৭)

ঋতু ও কাল ভেদে দুগ্ধের গুণাদির তারতম্য বিচার।

বিভিন্ন ঋতুতে এবং প্রাতঃকালাদি সময় বিশেষে গো-দুগ্ধের গুণাদির অনেক বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। বৈশাখ মাস হইতে নব তৃণাদি আহারজনিত গো-দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণাদি বৃদ্ধি হয়; এবং দুগ্ধ কিছু তরল হয়, বর্ষারম্ভে দুগ্ধের জলীয় ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নবনীত প্রভৃতি হ্রাস হয়। বর্ষা অন্তে শরৎকালের প্রারম্ভ হইতে দুগ্ধের পরিমাণ কিছু হ্রাস হয় বটে, কিন্তু তাহার নবনীত ইত্যাদি বাড়িতে থাকে। শীতকালে দুগ্ধ গাঢ় মিষ্ট এবং অধিক সারভাগ (নবনীত ছানা প্রভৃতি) বিশিষ্ট হইয়া থাকে। শীতকালে দুগ্ধের অম্লতা হয় এবং সর ভাগ বৃদ্ধি হয়। সময় বিশেষে দুগ্ধের গুণাদি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত এই যে, প্রাতঃকালীন

দুগ্ধে নবনীত ও অন্যান্য সার পদার্থ অধিক থাকে, এবং সর্ব্ব-কালেই দোহনের প্রথম ভাগ অপেক্ষা শেষ ভাগে দুগ্ধে সার পদার্থ অধিক থাকে, এবং গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। দোহনের প্রথম ভাগে দুগ্ধে ছানা ও শ্বেতসার (albumen) অধিক থাকে এবং শেষ ভাগে নবনীত ও সর (cream) অধিক থাকে। এ সম্বন্ধে ভাব প্রকাশের মত এই যে:—

"বৃষ্যং বৃংহণ মগ্নিদীপনকরং পূর্ব্বাহ্নকালে পয়ো।
মধ্যাহ্নেতু বলাবহং কফহরং পিত্তাপহং দীপনম্॥
রাত্রৌ পথ্যমনেক দোষশমনং চক্ষুর্হিতং সংস্মৃতম্॥"
বদন্তি পেয়ং নিশি কেবলং পয়ো
ভোজ্যং ন তেনেহ সহৌদনাদিকম্।
ভবেদজীর্ণং ন শয়ীত শর্ব্বরীঃ
ক্ষীরস্য পীতস্য ন শেষমুৎসৃজেৎ।
বিদাহীন্যন্নপানানি দিবা ভুঙ্ক্তে হি যো নরঃ
তদ্বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং রাত্রৌ ক্ষীরং সদা পিবেৎ॥"

পূর্ব্বাহ্নে দুগ্ধ পান করিলে, পুষ্টি, অগ্নিবৃদ্ধি এবং শুক্রবৃদ্ধি হয়। মধ্যাহ্নে সেবিত দুগ্ধ বলকারক, কফনাশক, পিত্তনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক হয়। রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের হিতসাধন ও নানা দোষ নাশ এবং চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয়। রাত্রিকালে অন্নাদির সহিত দুগ্ধ পান না করিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিবে এবং অজীর্ণ আশঙ্কায়

সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে না। দুগ্ধ পান করিয়া পাত্রে অবশিষ্ট রাখা উচিত নহে (কেন? তাহা বুঝিতে পারিলাম না)। যে ব্যক্তি দিবাভাগে বিদাহী (দাহজনক) অন্নাদি পান ভোজন করে, তাহার পক্ষে সেই বিদাহশান্তির জন্য রাত্রিতে দুগ্ধ সেবন প্রশস্ত।

প্রাতঃকালীন দুগ্ধ গুরু হওয়ার কারণ ভাবপ্রকাশে এই প্রকার কথিত হইয়াছে—

"রাত্রৌ চন্দ্র গুণাধিক্যাদ্ব্যায়ামাকরণাত্তথা।
প্রাভাতিকং প্রায়ঃ পয়ঃ প্রাদোষাদ্ গুরু শীতলম্॥
দিবাকর করাঘাতাৎ ব্যায়ামানিলসেবনাৎ।
প্রাভাতিকাত্তু প্রাদোষং লঘু বাত কফাপহম্॥"

সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে—

"প্রায়ঃ প্রাভাতিকং ক্ষীরংগুরু বিষ্টম্ভি শীতলং।
রাত্রৌ সোমগুণত্বাচ্চ ব্যায়ামাভাবতস্তথা।
দিবাকরাভিতপ্তানাং ব্যায়ামানিলসেবনাৎ।
বাতানুলোমি শ্রান্তিঘ্নং চাক্ষুষ্যঞ্চাপরাহ্ণিকম্॥"

উপরোক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ের তাৎপর্য্য এই যে, প্রাভাতিক দুগ্ধ প্রায়ই গুরু, বিষ্টম্ভী (কফবর্দ্ধক) এবং শীতল, কারণ রাত্রিকাল সোমগুণাধিক (ঠাণ্ডা!), তাহাতে আবার জন্তুগণের ব্যায়ামাভাব; প্রাতঃকালের পর জীবগণ সূর্য্যতাপে অভিতপ্ত হয় এবং ব্যায়ামানু-শীলন ও বায়ু সেবন করিয়া থাকে, এই জন্য তাহাদের দুগ্ধ প্রদোষে

(বিকাল বেলায়) বাতানুলোমন (বায়ুনাশক) শ্রান্তিনাশক, চাক্ষুষ্য (চক্ষুর হিতকারী), লঘু এবং কফনাশক হইয়া থাকে।

নির্ঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে—

"বৃষ্যং বৃংহণমগ্নিবর্দ্ধনকরং পূর্ব্বাহ্নপীতং পয়ো।
মধ্যাহ্নে বলদায়কং কফহরং কৃচ্ছ্রস্য বিচ্ছেদকম্।
* * * *
রাত্রৌ ক্ষীরমনেকদোষসমনং সেব্যং ততঃ সর্ব্বদা॥"

অর্থাৎ—পূর্ব্বাহ্নে দুগ্ধ পান করিলে তাহা বৃষ্য (বলকারক), বৃংহণ (শুক্রবর্দ্ধক) ও অগ্নিবর্দ্ধক হয়। মধ্যাহ্নে পীত দুগ্ধ পুষ্টিকারক, কফনাশক এবং কৃচ্ছ্র (মূত্রকৃচ্ছ্র) নিবারক হয়। রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিলে তাহা অনেক দোষ নষ্ট করে; অতএব সর্ব্বদাই (প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং রাত্রিতে) দুগ্ধ সেবন করিবে।

অন্যচ্চ—

"নিশা শীতাংশুসংশীতং নিদ্রালস্যশ্রমানুগং।
সঘনং শীতকফকৃৎ ক্ষীরং প্রাভাতিকং ভবেৎ॥
গব্যং প্রত্যূষসি ক্ষীরং গুরু বিষ্টম্ভি দুর্জরম।
তস্মাদভ্যুদিতে সূর্যে যাম যামার্দ্ধমেব বা
সমুত্তার্য্যে ততো গ্রাহ্যং তৎপথ্যং দীপনং লঘু॥"

রাত্রিতে চন্দ্রকিরণে শৈত্য হেতু এবং নিদ্রা, আলস্য ও শ্রমানুসারে (শ্রমের অভাবে) প্রাভাতিক দুগ্ধ ঘন, শীতল, ও কফকারক হয়। প্রাতঃকালের গো-দুগ্ধ গুরু, বিষ্টম্ভী (কফবর্দ্ধক)

এবং দুর্জর হয় (সহজে জীর্ণ হয় না), অতএব সূর্য্যোদয়ের পর এক প্রহর বা অর্দ্ধ প্রহর অতীত হওয়ার পর দুগ্ধ দোহন করিলে, সেই দুগ্ধ পথ্য (হিতজনক) দীপন (অগ্নিবৰ্দ্ধক) এবং লঘু হয়।

ভাবপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে—

"নম্নু শিষ্টা ভোজনান্তে দুগ্ধং পিবন্তি।"

(হিতকামী) শিষ্ট ব্যক্তিগণ ভোজনান্তে (অন্নাদি আহারের পর) দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। ইহার কারণ উক্ত গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে, কুতূহলী পাঠকবৃন্দ তাহা দেখিলেই সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবেন।

ব্রহ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"কুর্য্যাৎ ক্ষীরান্তমাহারং ন দধ্যন্তং কদাচন।"

আহারান্তে সর্ব্বশেষে দুগ্ধ পান করিবে, কখনও সর্ব্বশেষে দধি আহার করিবে না ; ইহার কারণ ভাবপ্রকাশে বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। পাঠকগণ উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারেন।

(১৮)

অবস্থা ও বয়োভেদে গো-দুগ্ধের গুণাদির তারতম্য :

যে সকল গাভী ক্ষুদ্রকায়া (ছোট), ব্যায়ামশীলা (চরিয়া বড়ায়) এবং যত্নে পালিতা ও সুস্থ দেহবিশিষ্টা, তাহাদের দুগ্ধ

সুস্বাদু, অধিক নবনীত ও সর পদার্থ (ছানা প্রভৃতি) যুক্ত হয়, বৃহৎকায় গাভী অপেক্ষা তাহাদের দুগ্ধ পরিমাণে অল্প হইলেও অধিক গুণবিশিষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছোট গাভীর আহার্য্যের পরিমাণও অল্প, অতএব তাহার পালন ব্যয়ও কম পড়ে।

সর্ব্বদা বদ্ধাবস্থায় থাকিলে (বাড়ীতে বাঁধা থাকিলে) গাভীর দুগ্ধ তত সুস্বাদু হয় না। কোনও কোনও পাশ্চাত্য গোপালক বলেন যে, বদ্ধাবস্থায় রক্ষিত গাভীর দুগ্ধ উৎকৃষ্ট ; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা ঠিক নহে। গাভীকে মধ্যে মধ্যে মাঠে চরিয়া বেড়াইতে দেওয়া উচিত তাহাতে তাহার স্বাস্থ্যও রক্ষিত হয় এবং দুগ্ধও সুস্বাদু ও উপাদেয় হয়।

প্রথম-প্রসূতা গাভীর দুগ্ধে নবনীত অল্প এবং জলীয়ভাগ অধিক থাকে, কিন্তু তাহার দুগ্ধ শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী। দ্বিতীয়বার বৎস প্রসবের পর হইতেই গাভীর দুগ্ধ ক্রমে গাঢ় ও মিষ্ট হইতে থাকে, এবং তাহাতে নবনীত প্রভৃতি সারভাগ বৃদ্ধি পায়। ৫। ৬ বৎসর বয়স্কা গাভীর দুগ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৮ বৎসর হইতেই গাভীর দৈহিক বল হ্রাস হইতে থাকে (কিন্তু এ নিয়ম সাধারণ নহে) এবং তৎসহ দুগ্ধের পরিমাণও কমিতে থাকে। কিন্তু তাহাতে নবনীত ইত্যাদি বাড়িতে থাকে ও দুগ্ধ গাঢ় ও মিষ্ট হয়। ১২। ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্তই গাভীর দুগ্ধ ভাল থাকে; অতঃপর গুণের হ্রাস হয়। অধিক বয়স্কা গাভীর দুগ্ধ শিশুকে ব্যবহার করাইতে হইলে,

তাহাতে পরিষ্কৃত জল, চুণের জল ও মিশ্রি মিশাইয়া দেওয়া উচিত। জল ইত্যাদির পরিমাণ শিশুর বয়স ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হ্রাস বৃদ্ধি করিতে হইবে। অতি বৃদ্ধা গাভীর দুগ্ধ তত ভাল নহে। গাভীর বৎস যত বড় হইতে থাকে, তাহার দুগ্ধ পরিমাণে তত কম হইতে থাকে, কিন্তু তাহাতে নবনীত প্রভৃতির পরিমাণ অধিক হইতে থাকে।

"গুণহীনং নিঃসারং ক্ষীরং প্রথমপ্রসূতানাং
মধ্যবয়সাং রসায়নমুক্তমিদং দুর্ব্বলন্তু বৃদ্ধানাম্॥"

অর্থাৎ—প্রথম-প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ গুণহীন এবং সাররহিত, মধ্যবয়স্থা গাভীর দুগ্ধ রসায়ন (জরাব্যাধিবিনাশক), বৃদ্ধা গাভীর দুগ্ধ দুর্ব্বল (বলকারক নহে)।

আরও কথিত হইয়াছে—

"মধুরং ত্রিদোষনাশনং ক্ষীরং মধ্যপ্রসূতানাং।
লবণং মধুরং ক্ষীরং বিদাহজননং চিরপ্রসূতানাম্॥"

মধ্য-প্রসূতার (গাভীর দুগ্ধ দেওয়ার সম্পূর্ণকালের মধ্যভাগে) দুগ্ধ মধুর ও ত্রিদোষ নাশক। চিরপ্রসূতার গাভীর (যাহার বৎস বড় হইয়াছে) দুগ্ধ লবণ ও মধুর স্বাদযুক্ত এবং বিদাহজনক।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে—

"বস্কয়িণ্যাস্ত্রিদোষঘ্নং তর্পণং বলকৃৎ পয়ঃ।"

চিরপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষনাশক, তর্পণ (তৃপ্তিদায়ক) ও বলকারক।

গাভীকে পুনঃ পুনঃ দোহন করিলে দুগ্ধে ক্রমে নবনীতের অল্পতা হয় এবং বৎসও দুর্ব্বল হইয়া যায়। ইহাতে গাভীরও বলহানি হয়। অতএব দিবসে দুই বারের অধিক গাভী দোহন করা উচিত নহে। বৎস, মাতৃ দুগ্ধ ত্যাগ করিবার (দুধ ছাড়িবার) অব্যবহিত পূর্ব্বে দুগ্ধ গাঢ় ও মিষ্ট হয় এবং তাহা অধিক গুণবিশিষ্ট হয়। দোহনকালে গাভীর অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অর্থাৎ সে যাহাতে চঞ্চল, ভীত অথবা বিমনস্ক না হয় এবং দোহনকারী কর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে আহত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দোহনকালে বৎসকে তাহার সম্মুখে এমনভাবে রাখিতে হইবে যে, মাতা অনায়াসে তাহাকে সস্নেহে লেহন করিতে পারে হঠাৎ আহার্য্য ও স্থান পরিবর্ত্তনে এবং দোহনকারীর পরিবর্ত্তনে গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, দোহনের পূর্ব্বে গাভীকে কিছু খাইতে দেওয়া উচিত। দোহনের পূর্ব্বে গাভীর স্তন ও ওলান ধুইয়া দিলে ভাল হয়। প্রথম দোহনের সময় কিছু দুগ্ধ পরিত্যাগ করা উচিত, কারণ ওলানে জমা দুগ্ধ অনিষ্টজনক হয়।

(১৯)

দুগ্ধের বর্ণ দেখিয়া তৎসম্বন্ধে গুণাদি বিচার।

অবস্থা, কাল, জাতি ও আহার ব্যবহার ভেদে গো-দুগ্ধের বর্ণ সম্বন্ধে অনেক পার্থক্য হয়। এস্থলে দুই একটী দৃষ্টান্ত

দ্বারা বর্ণ পরীক্ষার উপর নির্ভর করিয়া দুগ্ধের গুণাদি বিচার বিষয়ে বলা যাইতেছে।

(১) গাঢ় ও অতি শুভ্রবর্ণ দুধে ছানা অধিক থাকে। ঈদৃশ দুগ্ধ, দধি, ছানা, পনীর (Cheese) প্রভৃতি প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(২) নীলাভ তরল দুগ্ধ ;—ইহাতে নবনীত ও ছানার ভাগ অল্প থাকে, কিন্তু ইহা মিষ্ট এবং সুস্বাদু ; এবংবিধ দুগ্ধ শিশুর পক্ষে উপযোগী ; ইহাতে দধি, ছানা, ভাল নবনীত (মাখন) জন্মে না।

(৩) হরিদ্রাভ গাঢ় দুগ্ধ ;—ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, মালাই (সর) নবনীত প্রভৃতি প্রস্তুতের পক্ষে এই প্রকার দুগ্ধ প্রশস্ত, কারণ ইহা অধিক নবনীতযুক্ত হয়।

একটী কাচ পাত্রে অল্প দুগ্ধ রাখিয়া সেই পাত্রটী একটু সূর্য্যালোকে ধরিলেই দুগ্ধের বর্ণ লক্ষ্য করা যায়। উদ্দেশ্য ও অবস্থা বিবেচনায় দুগ্ধের বর্ণ পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা সর্ব্বদা সম্ভবপর নহে, কারণ বাজার হইতে আনীত দুগ্ধ অনেক প্রকার দুগ্ধ মিশ্রণজাত এবং তাহা কৃত্রিমতা দোষে দূষিত থাকে।

(২০)

দুগ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনাবৃত রাখার অপকারিতা।

দুগ্ধ যেমন জীবনীয় পদার্থের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনাবৃত অবস্থায় রাখিয়া ব্যবহার করিলে তেমনই অনিষ্টজনক, এমন কি প্রাণনাশকও হইতে পারে; কারণ বায়ুস্থিত দূষিত জীবাণুর আকর্ষণ ও সম্প্রসারণ পক্ষে দুগ্ধের অসীম শক্তি আছে। মানব চক্ষুর অবিষয়ীভূত অসংখ্য সূক্ষ্ম জীবাণু বায়ুমণ্ডলে বর্ত্তমান আছে, তাহার অনেকগুলিই বিষাক্ত। অতএব গাভী দোহন করিয়াই পাত্রের মুখ তৎক্ষণাৎ আবৃত করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ইহাতে দুগ্ধ ধূলি, মক্ষিকা এবং দূষিত জীবাণু হইতে রক্ষিত হইবে। দুগ্ধে দুর্গন্ধ ও অতি সহজে সঞ্চারিত হয়, অতএব পরিষ্কৃত স্থানেই গো-দোহন করা সঙ্গত। গোশালার অভ্যন্তরে গো-দোহন করিলে তাহা দোহনান্তে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আনা উচিত। মল মুত্রাদিযুক্ত গোশালাতে এবং পূতিগন্ধময় স্থানে গোদোহন না করাই শ্রেয়ঃ। বাজারে বিক্রয়ার্থ দুগ্ধ প্রায়ই অনাবৃত অবস্থায় আনীত, অতএব এই প্রকার দুগ্ধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে দুগ্ধের দূষিত জীবাণু সকল নষ্ট হইয়া যাইবে। ফলতঃ অগ্নির ন্যায় বিশুদ্ধিকারক পদার্থ জগতে আর নাই; তাহাতেই অগ্নিকে পাবক বলা যায়। বাজার

হইতে আনীত ও অনাবৃত অবস্থায় বহুক্ষণ রক্ষিত দুগ্ধ অগ্নিপক্ক না করিয়া ব্যবহার করা কখনও সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে গৃহস্থ মাত্রেরই দৃষ্টি রাখা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

(২১)

কি প্রকার পাত্রে গোদোহন, দুগ্ধ রক্ষা ও পান করা উচিত।

গোদোহনের জন্য মৃণ্ময় (মেটে হাঁড়ী) কাষ্ঠময়, কাংস (কাঁসার), কলাই করা লৌহ (Enamelled iron) ও দস্তার পাত্রই শ্রেষ্ঠ ; সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন হাঁড়িই উৎকৃষ্ট। গোদোহন করার পূর্ব্বে যে কোন প্রকার পাত্রই হউক, তাহা বেশ পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হইবে। মাটির হাঁড়ি হইলে তাহা গরম জলে ধৌত করিয়া, অগ্নির উত্তাপে একটু উষ্ণ ও শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে ; ইহাতে পাত্রস্থিত রোগজনক জীবাণু নষ্ট হইয়া যাইবে। ধাতুময় পাত্র কোন প্রকার অম্ল পদার্থ, বালি এবং ভস্ম (ছাই) দ্বারা ঘসিয়া ফেলিলেই পরিষ্কার হয়। ধাতু পাত্রগুলি অম্ল ইত্যাদি দ্বারা ঘসিয়া পুনর্ব্বার গরম জলে ধৌত করিতে হয়। স্থূল কথা, দোহন পাত্র অতি পরিষ্কৃত হওয়া চাই, অন্যথায় দুগ্ধ অচিরে নষ্ট হইয়া যাইবে।

অধুনা পাত্র বিশেষে রক্ষিত দুগ্ধের গুণাদি বলা যাইতেছে ;—

পাশ্চাত্য মতে কলাই করা তাম্র পাত্র দুগ্ধ রক্ষার পক্ষে

শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ তাম্রপাত্রস্থিত দুগ্ধ বিষাক্ত হইয়া যায়, অতএব তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান এই যে—

"তাম্রপাত্রে পয়ঃ পানং উচ্ছিষ্টে ঘৃতভোজনং।

দুগ্ধে চ লবণং দত্তাৎ সত্ত গোমাংসভক্ষণম্॥"

তাম্রপাত্রে দুগ্ধ পান, উচ্ছিষ্টে ঘৃত ভোজন, এবং লবণ যোগে দুগ্ধ পান সত্ত গো-মাংস ভক্ষণ তুল্য (অতএব অকর্ত্তব্য)।

আরও কথিত হইয়াছে ;—

"গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মত্ততুল্যং ঘৃতং বিনা।"

ঘৃত ব্যতীত অন্যান্য গব্য পদার্থ তাম্রপাত্রস্থ হইলে মত্ততুল্য হইয়া থাকে।

মতান্তরে কথিত হইয়াছে,—

"পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ তাম্রপাত্রে ন দূষ্যতি।"

অনুদ্ধৃত-সার দুগ্ধ (যে দুগ্ধের নবনীত প্রভৃতি উঠান হয় নাই) তাম্র পাত্রে রাখিলে দূষিত হয় না।

পাশ্চাত্য মতে রৌপ্যের গিল্টি করা (Silver plated) অথবা রৌপ্য পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে তাহা শীঘ্র অম্লস্বাদ বিশিষ্ট হয়, (টকিয়া যায়)।

লৌহ পাত্রস্থিত দুগ্ধ একটু লালচে (রক্তবর্ণ) হয় এবং তজ্জাত সর প্রভৃতি একটু কাল হয়। কিন্তু ইহাতে দুগ্ধ টক হয় না।

পিত্তলের পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে তাহা হরিদ্বর্ণ (সবুজ রং) এবং বিস্বাদ হইয়া যায়।

টিনের পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া তাহা চা'র (Tea) সহিত মিশাইলে নীলাভ হইয়া যায় এবং বিস্বাদও হয়।

পোড়া মাটির নূতন হাঁড়িতে দুগ্ধ রাখিলে তাহাতে মেটে গন্ধ হয়, কিন্তু পুরাতন হাঁড়ি হইলে তাহা হয় না, বস্তুতঃ ইহা দুগ্ধ রাখার পক্ষে উৎকৃষ্ট।

দস্তা অথবা কাঁসার পাত্রও দুগ্ধ রাখার পক্ষে মন্দ নহে।

চীনামাটি ও কাচের পাত্র তাপের অপরিচালক, অতএব এগুলি দুগ্ধ রাখার পক্ষে প্রশস্ত নহে, কারণ এবংবিধ পাত্রস্থ দুগ্ধ সহজে টক হইয়া যায়।

দুগ্ধ রাখার পাত্র অতি নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত হওয়া চাই, নতুবা নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

আজকাল এলুমিনাম্ নামক এক প্রকার নবাবিষ্কৃত ধাতু পাত্র প্রচলিত হইয়াছে, ইহাতে দুগ্ধ রাখিলে কি প্রকার অবস্থা হয় তাহা আমাদের জানা নাই।

সুশ্রুত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে পানীয় পদার্থ (দুগ্ধ প্রভৃতি মৃণ্ময়, স্ফটিক (Crystal) কাচ (Glass), মণিময় (বৈদুর্য্য প্রভৃতি) পাত্রে পান করা প্রশস্ত।

চর্য্যা চন্দ্রোদয় নামক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

"তাম্রে তাপহরং পাত্রে সৌবর্ণে পিত্তনাশনম্।
রৌপ্যে শ্লেষ্মহরং প্রোক্তং কাংস্যে রক্তপ্রসাদনম্॥

আয়সে তু শৃতং ক্ষীরং কৃমিপিত্তকফপ্রণুৎ।
কান্তসারময়ং শ্রেষ্ঠং ত্রিদোষঘ্নং রসায়নম্ ॥
কুষ্ঠ প্রমেহ পিড়িকা কৃমি গুল্মাগ্রশূলনুৎ।
মৃৎপাত্রে তু শৃতং ক্ষীরং তাম্রপাত্রে শৃতং যথা ॥”

তাৎপর্য্য এই যে—তাম্রপাত্রে দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহা তাপহারী, সুবর্ণপাত্রে পিত্তনাশক, রৌপ্যে শ্লেষ্মানাশক, কাংস্যে (কাঁসার পাত্রে) রক্তনাশক, লৌহপাত্রে কৃমি পিত্ত ও কফনাশক হয়, কান্তসারময় পাত্রে (চুম্বক-লৌহ পাত্রে) দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহা ত্রিদোষঘ্ন ও রসায়ন (জরা ব্যাধিনাশক) হয়। ইহা কুষ্ঠ, প্রমেহ, পিড়িকা (চুলকান), কৃমি, গুল্ম, রক্তদোষ এবং শূলনাশক বলিয়া জানিবে। মৃৎপাত্রে দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহা তাম্রপাত্রে জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের তুল্য গুণ বিশিষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে তাম্র পাত্রে দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া অত্যন্ত নিষিদ্ধ, আমাদেরও ইহাই মত। অতএব তাম্রপাত্রে দুগ্ধ জ্বাল না দেওয়াই ভাল মনে করি।

(২২)

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দুগ্ধ অবিকৃত রাখার উপায়।

সাধারণতঃ শীতকালে দুগ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহা অতি সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, সমতল ভূমিতে খাঁটি দুগ্ধ ১৫। ১৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত

এবং পর্ব্বত শিখরে প্রায় ইহার দ্বিগুণ কাল পর্য্যন্ত ভাল থাকে।

রাজ নির্ঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে—

"মুহূর্ত্ত পঞ্চকাদূর্দ্ধং ক্ষীরং ভবতি বিকৃতং।
তদেব দ্বিগুণে কালে বিষবদ্ধন্তি মানবম্॥"
উক্তঞ্চ—ক্ষীরং মুহূর্ত্তত্রিত যোষিতং যদতপ্তমেব
বিকৃতিং প্রযাতি।
উষ্ণঞ্চ দোষং কুরুতে তদূর্দ্ধং বিষোপমং স্যাদূষিতং
দশানাম্॥"

অর্থাৎ—পাঁচ মুহূর্ত্তের (দিবারাত্রির মানের ত্রিশ ভাগের এক ভাগকে মুহূর্ত্ত বলা যায়) উর্দ্ধকালস্থায়ী দুগ্ধ বিকৃত হইয়া যায় এবং ইহার দ্বিগুণ কালে তাহা মানবকে বিষবৎ নাশ করে। (অতএব তাহা অব্যবহার্য্য)। আরও কথিত হইয়াছে যে অতপ্ত দুগ্ধ তিন মুহূর্ত্ত (এক মুহূর্ত্তের পরিমাণ মোটামুটি হিসাবে দুই দণ্ড অর্থাৎ প্রায় এক ঘণ্টাকাল); কাল স্থায়ী হইলে বিকৃত হয়, তদূর্দ্ধকাল পরে তাহা উত্তপ্ত করিলে দূষিত হয় এবং দশ মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী দুগ্ধ বিষতুল্য হয়। অনেক দূরস্থান হইতে আনীত দুগ্ধ আন্দোলন বশতঃ পাত্রের সহিত পুনঃ পুনঃ ঘৃষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্দেশীয় দুগ্ধ ব্যবসায়িগণ উক্ত দোষ নিবারণার্থ দুগ্ধপূর্ণপাত্রে বিন্নণ পত্র, (বিন্নার পাতা), তুলসী পত্র, অথবা ২।৪টী কাঁচা লঙ্কা মরিচ দিয়া থাকে; কিন্তু এগুলি

কতদূর উদ্দেশ্যসাধক, তাহা বলা যায় না। পাশ্চাত্যমতে দুগ্ধে Vanilla (এক প্রকার orchid--পরগাছা) Salycelic Acid (সেলিসিলেক্ এসিড্) ফার্ম্মালিন, বোরাসিক্ এসিড, অথবা Borax (সোহোগা-চূর্ণ) দিয়া রাখিলে তাহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। পূর্ব্বোক্ত এসিডের কোনও প্রকার স্বাদ নাই, অতএব ইহাতে দুগ্ধ বিস্বাদ হয় না।

ফারণ্‌হিটের তাপমান যন্ত্রের ৬৫° ডিগ্রী হইতে ৬৮° ডিগ্রী পরিমাণ উত্তাপযুক্ত দুগ্ধে এক পাইণ্টে (২০ আউন্সে) ২ গ্রেণের ন্যূন সেলিসিলিক্ এসিড্ মিশাইলে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এবং ৮৫° ডিগ্রী উত্তাপ বিশিষ্ট দুগ্ধে উক্ত পরিমাণ এসিড মিশাইলে সমস্ত দিনমান অবিকৃত থাকে। কম উত্তাপের দুগ্ধে পূর্ব্ব কথিত এসিড ৪ গ্রেণ পরিমাণ মিশ্রিত করিলে তাহা ১২। ১৩ দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত ভাবে থাকে।

পূর্ব্বোক্ত উপায়গুলি ব্যতীত দুগ্ধ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখার জন্য নিম্নোক্ত ত্রিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়।

যথা :—

1. Chemical (রাসায়নিক)
2. Physical (প্রাকৃতিক)
3. Condensation (ঘনীভূতকরণ)

[১] কোনও প্রকার alkaline salt (ক্ষার পদার্থ, যথা সোডা, পটাস প্রভৃতি) এবং anteseptic (পচননিবারক, যথা,

সুরাবীর্য্য (alcohol) (chloride of zinc) ক্লোরাইড্ অব জিঙ্ক এবং লবণ প্রভৃতি যোগে দুগ্ধ অবিকৃত রাখার উপায়কে (chemical) রাসায়নিক উপায় বলা যায়।

[২] কোনও প্রকার শীতল পদার্থ (বরফ ইত্যাদি) যোগে এবং অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ও বায়ু সঞ্চালন দ্বারা দুগ্ধ অবিকৃত রাখার উপায়কে (Physical) প্রাকৃতিক উপায় বলা যায়।

[৩] জ্বাল দিয়া দুগ্ধের জলীয় ভাগ দূর পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া তাহাতে শর্করা প্রভৃতি যোগে পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দুগ্ধ অবিকৃত রাখার উপায়কে (condensation) ঘনীভূতকরণ বলা যায়।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে দ্বিতীয়োক্তটীই (প্রাকৃতিক (physical) উপায়ই) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ফলদায়ক। শৈত্য-যোগে (বরফ-যোগে) দুগ্ধ ১৩। ১৪ দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে। অগ্নির উত্তাপে দুগ্ধের সমস্ত দুর্গুণ এবং তৎস্থিত বিষাক্ত জীবাণুও নষ্ট হইয়া যায়। ফলতঃ অগ্নির ন্যায় পবিত্রকারক পদার্থ আর জগতে একটীও নাই, তাই ইহাকে পাবক বলা যায়। রুগ্ন ব্যক্তির আনীত, রুগ্না গাভীর অথবা কদর্য্য জল প্রভৃতি মিশ্রিত দুগ্ধ অগ্নির উত্তাপে শোধিত হয়। শৈত্যযোগে রক্ষিত দুগ্ধ ১৪ দিন পরে বিস্বাদ হয় এবং ২৮ দিন পরে তাহা জমাট বাঁধিয়া যায়। ৩। ৪ দিন পরে এবংবিধ দুগ্ধ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়। বায়ু সঞ্চালনে দুগ্ধ তদপেক্ষা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত

রাখা যায়, অতএব সংক্ষেপে বায়ু সঞ্চালনের উপায় কথিত হইতেছে।

প্রথমতঃ কোনও উচ্চস্থান হইতে দুগ্ধের ধারা পাত করিলে তাহা বায়ু সংযোগে কণাভাব ধারণ করিবে। এতদবস্থায় সেই দুগ্ধকে তারের অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত জালদ্বারা আবৃত মুখবিশিষ্ট পাত্রে প্রবিষ্ট করাইলেই তাহাকে ইবেটেড্ (বায়ু সঞ্চালিত) দুগ্ধ বলা যায়। বরফ অথবা করকা (শিলা Hailstone) প্রভৃতি শীতল পদার্থের উপর বায়ু প্রবাহিত করিয়া সেই শীতল বায়ু দুগ্ধে উপরোক্ত উপায়ে সঞ্চালিত করিতে পারিলে ইরেসন্ আরও উৎকৃষ্ট হয় এবং ইহাতে দুগ্ধ নির্দ্দোষ অবস্থায় অনেকক্ষণ অবিকৃত থাকে।

অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে দুগ্ধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল থাকে, কিন্তু ইহাতে দুগ্ধের আস্বাদ ও গন্ধের কিছু বিপর্য্যয় ঘটে এবং দুগ্ধস্থিত গ্যাস (Gas) গুলি বাহির হইয়া যায় ও তাহাতে গুণহানি হয়; অতএব দুগ্ধপাত্রের মুখ আবৃত করিয়া, অগ্নির উত্তাপে উষ্ণ করিয়া তাহাতে শীতল জলধারা পাতে ঠাণ্ডা করিলে উপরোক্ত দোষ ঘটে না। এববিধ উপায়ে দুগ্ধ উত্তপ্ত করার অনেক যন্ত্র পাওয়া যায়। সেগুলিকে (refrigerator) রিফ্রিজারেটার বলে, এসব যন্ত্র সচরাচর ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

পচন নিবারক পদার্থ (Antiseptic) যোগে দুগ্ধ রক্ষার উপায়টী তত নিঃসন্দেহ জনক নহে অতএব ইহার উপর সর্ব্বদা

নির্ভর করা যাইতে পারে না, এই জন্য এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

এখন condensation (ঘনীভূত করণোপায়) বিষয়ে ২।৪টী কথা বলা যাইতেছে। আমেরিকা মহাদেশস্থ নিউ ইয়র্ক (New York) নগরের অন্তঃপাতী (Whiteplain) হোয়াইট প্লেইন নিবাসী Mr. Gael Borden (মেঃ গেইল্ বোরডেন্) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ১৮৪৯ খৃঃ অব্দ হইতে চেষ্টা আরম্ভ করিয়া ১৮৫১ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম (condensed milk) জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত করণ বিষয়ে কৃতকার্য্য হন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে এবংবিধ দুগ্ধ শর্করাদি যোগে মিষ্ট করিয়া টীনের পাত্রে বদ্ধাবস্থায় তিনি প্রথমতঃ সৈনিক বিভাগে প্রচলিত করেন; অতঃপর ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে উক্ত মহাত্মার উদ্ভাবিত উপায়ে অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর দুগ্ধ জমাট অবস্থায় দেশ দেশান্তরে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। অধুনা ইংলণ্ড, আয়রল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ডেনমার্ক, নরওয়ে, বেভিবিয়া, প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় সভ্যদেশ হইতে প্রচুর জমাট দুগ্ধ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। ভারতবর্ষেও আজকাল এবংবিধ দুগ্ধ নগরে নগরে, এমন কি পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত বিক্রীত হইতেছে; ইহা আমাদের পক্ষে শুভসূচক কিনা বিবেচ্য। সম্প্রতি কোনও উৎসাহী বঙ্গীয় যুবক [Condensed milk] জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া টীন পাত্রে আবদ্ধাবস্থায় বিক্রয় করিতেছেন, এক্ষেত্রে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয় এবং উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত; কিন্তু

টীন পাত্রে দীর্ঘকাল রক্ষিত দুগ্ধ স্বাস্থ্য-হানিকর কিনা ; এ বিষয়ে চিকিৎসকগণের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় ইহা অনিষ্টজনক, শিশুকে এবংবিধ দুগ্ধ ব্যবহার করান ভাল নহে। আমাদের দেশে ক্রমে যে প্রকার দুগ্ধাভাব হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় দধি প্রভৃতির জন্যও অচিরে আমাদিগকে ইয়ুরোপের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। অতএব সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন করা দেশহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের কর্ত্তব্য।

জমাট দুগ্ধ (Condensed milk) প্রস্তুত করণোপায় পাঠকগণ ইংরেজী গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিলেই বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিবেন, বাহুল্য ভয়ে সে সমুদয় উদ্ধৃত হইল না। Condensed milk দুই প্রকার (১) শর্করাযুক্ত এবং (২) শর্করাবিহীন। এতদুভয় প্রকার দুগ্ধে কি পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে নারী দুগ্ধের তুল্য হয় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	নারী দুগ্ধ	শর্করা যুক্ত জমাট দুগ্ধ ৭ গুণ জলমিশ্রিত	শর্করা বিহীন জমাট দুগ্ধ। ৪ চারি গুণ জল মিশ্রিত
Proteed (ছানা)	শতকরা ২ ভাগ	শতকরা ১.৩ ভাগ	শতকরা ২.১ ভাগ
Fat চর্ব্বী	শতকরা ৩.৫ ভাগ	শতকরা ১.১ভাগ	শতকরা ১.৯ ভাগ
Sugar শর্করা	শতকরা ৭ ভাগ	শতকরা ৬.৭ ভাগ	শতকরা ২.৬ ভাগ

(২৩)

যে যে অবস্থায় গোদুগ্ধাদি মানব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় এবং তত্তদবস্থায় ফলাফল।

দুগ্ধ (১) ধারোষ্ণ, (২) অপক্ব (কাঁচা) (৩) ফেন, (৪) ঈষদুষ্ণ (৫) মাখনটানা, (৬) বিশেষ ভাবে আবর্ত্তিত (ঘন), (৭) দৃঢ় (ক্ষীরসা বা মেওয়া), (৮) চূর্ণীকৃত ইত্যাদি অবস্থায় মানব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়; এতদ্ব্যতীত শর্করাদি ও অন্যান্য নানাবিধ পদার্থ যোগে দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১) ধারোষ্ণ দুগ্ধ—গো দোহন করা মাত্র দুগ্ধ ঈষদুষ্ণ থাকে, এই অবস্থার দুগ্ধকে ধারোষ্ণ বলা যায়, ইহা সফেন, মিষ্ট, মসৃণ এবং ঈষৎ জান্তব গন্ধ যুক্ত এবম্বিধ দুগ্ধ বিশেষ উপকারী। আয়ুর্ব্বেদে ইহার বিশেষ গুণ কথিত হইয়াছে:—

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে

* * * * ধারোষ্ণমমৃতোপমম্।

ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃততুল্য।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে—

"ধারোষ্ণং গোপয়ো বল্যং লঘুশীতং সুধাসমং।
দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং তদ্ধারা শিশিরং ত্যজেৎ॥
ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারাশীতন্তু মাহিষম্॥"

অর্থাৎ—ধারোষ্ণ গোদুগ্ধ বলকারক, লঘু, শীতবীর্য্য এবং অমৃতসম; ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর, ত্রিদোষনাশক। ধারা-শীতল গোদুগ্ধ ত্যাগ করিবে। গোদুগ্ধ ধারোষ্ণ এবং মাহিষঃদুগ্ধ ধারা-শীতলই প্রশংসনীয়।

নির্ঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে—

"উক্তং গব্যাদিকং দুগ্ধং ধারোষ্ণমমৃতোপমং ।
সর্ব্বাময়হরং পথ্যং চিরসংস্থন্তু দোষদম্ ॥
দোহনান্তু শীতং মহিষীপয়শ্চ গব্যঞ্চ ধারোষ্ণমিদং
প্রশস্তম্।"

অর্থাৎ—গবাদির ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃততুল্য বলিয়া কথিত; ইহা সর্ব্বরোগনাশক, পথ্য (হিতজনক), কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে দোষজনক হয়। গব্য দুগ্ধ ধারোষ্ণ এবং মহিষ দুগ্ধ দোহনান্তে শীতল হইলে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

সুশ্রুত সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

"ধারোষ্ণং গুণবৎ ক্ষীরং বিপরীত মতোহন্যথা।"

অর্থাৎ—ধারোষ্ণ দুগ্ধ গুণবিশিষ্ট কিন্তু তদ্বিপরীতে (শীতল হইলে) তাহার অন্যথা হয় (গুণহীন হয়)।

অন্যত্র কথিত হইয়াছে—

"ধারোষ্ণমমৃতং পয়ঃ শ্রমহরং নিদ্রাকরং কান্তিদং।
বৃষ্যং বৃংহণমগ্নিবর্দ্ধকমতি স্বাদু ত্রিদোষঘ্নম্॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃততুল্য, শ্রমনাশক,

নিদ্রাকর, এবং কান্তিদায়ক, ইহা বৃষ্য (বলকারক), বৃংহণ (শুক্র-বর্দ্ধক), অগ্নিবর্দ্ধক, অতিশয় স্বাদু, এবং ত্রিদোষনাশক। অপিচ—

"ধারোষ্ণমমৃতং পথ্যং ধারাশীতং ত্রিদোষকৃৎ।"

ধারোষ্ণ দুগ্ধ অমৃত তুল্য, পথ্য এবং ধারাশীতল দুগ্ধ ত্রিদোষকারক।

(২) অপক্ক দুগ্ধ—অপক্ক দুগ্ধ (কাঁচা দুধ) সেবন করা উচিত নহে। কারণ ইহাতে নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তি হয় এবং ইহা নানাপ্রকার বিষাক্ত জীবাণুদ্বারা দূষিত থাকে। এবংবিধ দুগ্ধ পান করিতে হইলে কাপড়ে ছাঁকিয়া একটু উষ্ণ করিয়া ("১৫।২০ মিনিট পর্য্যন্ত) লওয়া কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে ভাব প্রকাশে কথিত হইয়াছে।

"আমং ক্ষীরমভিষ্যন্দি গুরু শ্লেষ্মাবিবর্দ্ধনং।
জ্ঞেয়ং সর্ব্বমপথ্যঞ্চ গবামাহিষবর্জ্জিতম্।
নারীক্ষীরন্ত্বামমেব হিতং নতু শৃতং হিতম্॥"

অর্থাৎ— আম দুগ্ধ (কাঁচা দুধ) কফ বর্দ্ধক, গুরু এবং শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, অতএব গো ও মহিষ দুগ্ধ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার অপক্ক দুগ্ধই অপথ্য অহিতজনক বলিয়া জানিবে। কিন্তু নারী দুগ্ধ অপক্ক অবস্থাতেই হিতজনক, জ্বাল দেওয়া হইলে তাহা অনিষ্টকর হয়।

ভাবপ্রকাশে আরও উক্ত হইয়াছে—

"অর্দ্ধোদকং ক্ষীরং শিষ্টমামাল্লঘুতরং ভবেৎ।
পয়োহভিষ্যন্দি গুর্ব্বাণং প্রায়শঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥

অর্থাৎ—দুগ্ধে অর্দ্ধেক পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলে তাহা অপক্ক দুগ্ধ হইতে লঘুতর হয়। কাঁচা দুধ প্রায়শঃ গুরু এবং অভিষ্যন্দী (কফবর্দ্ধক)।

অষ্টাঙ্গ হৃদয়ে কথিত হইয়াছে—

"ক্ষীরং ন যুঞ্জীত কদাপ্যতপ্তং—

পয়োভিষ্যন্দি গুর্ব্বাণং যুক্ত্যা শৃতমতোঽন্যথা।"

অর্থাৎ কাঁচা দুধ কখনও ব্যবহার করিবে না। ... ... কাঁচা দুধ অভিষ্যন্দি (কফকারক) গুরু, কিন্তু তাহা উপযুক্তরূপে জ্বাল দিয়া লইলে তদন্যথা (লঘু) হয়।

নির্ঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে—

"ক্ষীরং কাস শ্বাস কোপায সর্ব্বং গুর্ব্বামং

স্যাৎ প্রায়শো দোষদাযি———————।"

...নারী ক্ষীরস্ত্বামমেবাময়ঘ্নম্।"

ভবেচ্ছীতং যত্তু ন পাচিতং তদখিলং বিস্টভ্য দোষ প্রদম্"

অর্থাৎ—প্রায সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধই অপক্কাবস্থায কাস, শ্বাস প্রকোপকারক, গুরু এবং দোষজনক হইয়া থাকে, কিন্তু নারীদুগ্ধ অপক্ক অবস্থায়ই রোগনাশক। যে দুগ্ধ শীতল ও অপক্ক, তৎসমস্তই বিষ্টভ্য দোষকারক (মলরোধক) হইযা থাকে।

(৩) দুগ্ধ ফেন।—গাভী ও অন্যান্য দুগ্ধদাত্রী স্ত্রীজাতীয় জীবের দোহনকালে স্তন্যধারা দোহন-পাত্রে আহত হইয়া পাত্রের উপরিভাগে যে ফেন জন্মে, তাহাকে "দুগ্ধফেন" বলা যায়।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে—

"গোদুগ্ধপ্রভবং কিংবা ছাগীদুগ্ধসমুদ্ভবং।
ভবেৎ ফেনং ত্রিদোষঘ্নং রোচনং বলবর্দ্ধনম্॥
বহ্নিবৃদ্ধিকরং পথ্যং সদ্যস্তৃপ্তিকরং লঘু।
অতিসারেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরে চ জীর্ণে প্রশস্যতে॥"

অর্থাৎ—গোদুগ্ধজাত ফেন অথবা ছাগী দুগ্ধের ফেন ত্রিদোষঘ্ন, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, পথ্য, সদ্যতৃপ্তিজনক এবং লঘু। ইহা অতিসারে, অগ্নিমান্দ্য, জ্বরে, এবং অজীর্ণ রোগে প্রশস্ত। অত্রিসংহিতায় কথিত হইয়াছে :—

"কৃষ্ণ গোহপশয়ঃফেনমজানাং বেতিশস্যতে।
মন্দাগ্নীনাং কৃশানাঞ্চ বিশেষাদতিসারিণাম্॥
উৎসাহদীপনং বল্যং মধুরং বাতনাশনং।
সদ্যোবলকরঞ্চৈব তচ্চ ক্ষীর বিলোড়িতং॥
ক্ষীণ জ্বরাতিসারেচ সমেচ বিষমে জ্বরে।
মন্দাগ্নৌ কফমাশ্রিত্য পযফেনং প্রশস্যতে॥"

তাৎপর্য্যার্থ—কৃষ্ণা গাভী, অশ্ব, অথবা ছাগদুগ্ধজ ফেন প্রশস্ত, এ সকল মন্দাগ্নি, কৃশ, বিশেষতঃ অতিসারী রোগীর পক্ষে হিত জনক এবং এ সমুদয় উৎসাহবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক মধুর ও বায়ুনাশক। ফেন দুগ্ধের সহিত আলোড়িত হইলে সদ্য বলকারক হয়। দুগ্ধ ফেন ক্ষীণাবস্থায়, জ্বরাতিসারে সম ও বিষমজ্বরে এবং কফাশ্রিত মন্দাগ্নিতে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

৯) ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।—ফারেণ্‌হিটে (তাপমান যন্ত্রের) ২১২° ডিগ্রী এবং সেণ্টিগ্রেড্ স্কেল তাপমানের ১০০° ডিগ্রী উত্তাপে দুগ্ধ ও জল ফুটিতে আরম্ভ করে এবং ফারেণ্‌হিটের ৩২° ডিগ্রী এবং সেণ্টিগ্রেডের ০° ডিগ্রীতে জল জমিয়া বরফ হয়, কিন্তু ফারেণ্‌হিটের ৩০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত শীতল না হইলে দুগ্ধ জমে না। দুগ্ধ ফুটিতে আরম্ভ করিলেই তাহাকে ঈষদুষ্ণ (এক ফুট ফলকের দুধ) বলা যায়, ইহা রোগী ও শিশুর পক্ষে বিশেষ উপকারী। ১৫। ২০ মিনিট পর্য্যন্ত দুগ্ধ অগ্নির উত্তাপে রাখিলেই ফুটিতে আরম্ভ করে, এবং তাহার দূষিত জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদে কথিত হইয়াছে—

"শৃতোষ্ণমাবিকং পথ্যং শৃতশীতমজাপয়ঃ।"

"মেষী দুগ্ধ জ্বাল দিয়া উষ্ণ থাকিতে এবং ছাগী-দুগ্ধ শীতল হইলে হিতজনক হয়।

নিঘণ্টুতে কথিত হইয়াছে—

"তচ্চেৎ ক্বাথাবর্ত্তিতং পথ্যমুত্তম।'

তাহা (দু) ক্বাথাবর্ত্তিত হইলে হিতজনক হয়। উক্ত গ্রন্থে আরও উক্ত হইয়াছে যে—

নারীক্ষীরন্তু শৃতোষ্ণং কফবাতঘ্নং শৃতশীতন্তু
পিত্তঘ্নং ... ... শৃতশীতং ত্রিদোষঘ্নং।"

নারী দুগ্ধ জ্বাল দিয়া উষ্ণ থাকিতে পান করিলে কফ ও বাত নাশক হয় এবং তাহা শীতল হইলে পিত্ত ও ত্রিদোষ নাশক হয়।

সুশ্রুত সংহিতায় কথিত হইয়াছে :—

"তদেবোষ্ণং লঘুতরমনভিষ্যন্দি বৈ শৃতং।

বর্জয়িত্বা স্ত্রিয়াঃ স্তন্যং … … …।"

অর্থাৎ—নারীদুগ্ধ ব্যতীত অন্যান্য দুগ্ধ জ্বাল দিলে লঘুতর এবং অনভিষ্যন্দী (কফনাশক) হয়।

(৫) মথিত দুগ্ধ (মাখনটানা দুধ)।—

দুগ্ধের নবনীত (মন্থন দ্বারা) উঠাইয়া খাইলে তাহা একটু নীলাভ হয়, ঈদৃশ দুগ্ধ কিছু উষ্ণ করিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বালকের পক্ষে অত্যন্ত হিতজনক। বার ঘণ্টার পর এই প্রকার দুগ্ধ ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ ইহার পর তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে—

"ক্ষীরং গব্যমথাজন্বা কোষ্ণং দণ্ডাহতং পিবেৎ।

লঘু বৃষ্যং জ্বরহরং বাতপিত্তকফাপহম্॥"

অর্থাৎ—গব্য অথবা ছাগ দুগ্ধ মথিত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তাহা পান করিলে লঘু, বৃষ্য, (বলকারক) এবং বাত, পিত্ত ও কফনাশক হয়।

(৬) বিশেষভাবে আবর্ত্তিত দুগ্ধ (ঘন দুধ ক্ষীর প্রভৃতি)।—ঘন দুধ ও ক্ষীর সুস্বাদু গুরু এবং বলকারক। শুষ্ক গোময়ের (ঘুঁটের) আগুনে দুগ্ধ আবর্ত্তিত করিলে তাহা অতি সুস্বাদু হয় এবং দুগ্ধের বর্ণও অতি পরিষ্কার হয়। দুগ্ধ জ্বাল দেওয়ার সময়

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, সামান্য অমনোযোগে দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। জ্বাল দেওয়ার সময় পুনঃ পুনঃ আলোড়িত করিতে হয়। একটী পাত্রে জল রাখিয়া তদুপরি দুগ্ধপূর্ণ পাত্র রাখিয়া উভয় পাত্রের সংযোগস্থল ময়দা অথবা মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহার বর্ণ অতি শুভ্র হয় এবং দুগ্ধের স্বাদও মিষ্ট হয়। দুগ্ধ পাত্রের মুখটী ঢাকিয়া দিলে আরও ভাল হয়।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে—

—নির্ঘণ্টুক্ত :

"সুশৃতঞ্চ পয়ঃ পীতং পীযূষাদপি তদ্গুরু।"

ঘন দুগ্ধ পান করিলে তাহা পীযূষ (সদ্যপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধকে পীযূষ বলা যায়) হইতে গুরু।

উক্ত গ্রন্থে আরও কথিত হইয়াছে—

"চতুর্ভাগং সলিলং নিধায় যত্নাৎ সদাবর্ত্তিত মুত্তমং।

সর্ব্বাময়ঘ্নং বলপুষ্টিকারি বীর্য্যপ্রদং ক্ষীরমতি প্রশস্তম্॥

অর্থাৎ—চতুর্ভাগ (চারি ভাগ) জল মিশাইয়া দুগ্ধ উত্তমরূপে আবর্ত্তিত করিলে (জ্বাল দিয়া ঘন করিলে) তাহা সর্ব্বরোগ নাশক, বলকারক, পুষ্টিকারক ও বীর্য্যপ্রদ হয়, এতাদৃশ দুগ্ধ অতি প্রশস্ত।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে—

"তদেবাতি শৃতং সর্ব্বং গুরু বৃংহণমুচ্যতে।

অর্থাৎ—সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধ অতি শৃত (জ্বাল দিয়া ঘন) করিলে গুরু ও বৃংহণ (বলকারক) হয়।

আরও উক্ত হইয়াছে—

"নিত্যং তীব্রাগ্নিনা সেব্যং সুপক্বং মাহিষং পয়ঃ।
পুষ্যন্তি ধাতবং সর্ব্বে বল-পুষ্টি বিবর্দ্ধনম্॥"

তীব্রাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তি (যাহার পরিপাকশক্তি প্রবল) সুপক্ব মহিষদুগ্ধ নিত্য সেবন করিবে; ইহা সকল ধাতু-পোষণকারী এবং বল ও পুষ্টিকারক।

"জলেন রহিতং দুগ্ধমতিপক্বং যথা যথা।
তথা তথা গুরু স্নিগ্ধং বৃষ্যং বলবিবর্দ্ধনম্॥"

জলরহিত দুগ্ধ যে যে ভাবে অতি পক্ব করা যায়, সেই সেই ভাবেই তাহা গুরু, বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক) ও বল বর্দ্ধক হয়।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে ঘনীভূত অবস্থায় টীনে বদ্ধ হইয়া যে দুগ্ধ আমদানী হইতেছে, তাহাকে Condensed Milk (কনডেন্স্‌ড মিল্ক) বলা যায়। এ বিষয়ে পূর্ব্বেই বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে, অতএব পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ঘনীভূত দুগ্ধের জলীয় ভাগ অগ্নির উত্তাপে নষ্ট করিলে তাহাকে ক্ষীরসা বা মেওয়া বলা যায়। ইহা দ্বারা নানাপ্রকার মিঠাই প্রস্তুত করা যায়। ক্ষীর ও ক্ষীরসা বালকদিগকে অধিক খাইতে দেওয়া উচিত নহে। শীতকালে ক্ষীর এবং ক্ষীরসা অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে।

দৃঢ় দুগ্ধ (ক্ষীরসা বা মেওয়া)

দৃঢ় দুগ্ধ (ক্ষীরসা) আরও কিছু উত্তপ্ত করিলেই তাহা চূর্ণ করা যায়। অধুনা ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে নানাপ্রকার উপাদানযুক্ত চূর্ণ দুগ্ধ এদেশে আমদানী হইতেছে, তন্মধ্যে [1] (Horlick's Milk) হরলিকস্ মিল্ক [2] Allenbury's) Milk) এলেনবরিস মিল্ক এবং [3] (Nestle's Milk) নেসেলস মিল্ক বিশেষ বিখ্যাত। এগুলির মধ্যে হরলিক্স্ মিল্ক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; বালক ও রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলে উক্ত প্রকার চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ তাহাতে অল্প শর্করা (চিনি) যোগ করিলেই অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে এতাদৃশ দুগ্ধ চূর্ণ প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য।

চূর্ণীকৃত দুগ্ধ

চিনি, গুড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যোগে দুগ্ধ দ্বারা যত প্রকার উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে এমত বোধ হয় জগতে আর কিছুতেই হয় না। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক বিধায় পরিত্যক্ত হইল। বাব্‌ড়ী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খাদ্য শর্করা যুক্ত দুগ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শর্করাদিযুক্ত দুগ্ধ

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে—

"খণ্ডেন সহিতং দুগ্ধং কফকৃৎ পবনাপহং।

সিতাসিতাপলাযুক্তং শুক্রলং ত্রিমলাপহম্॥

সগুড়ং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মাকরং পয়ঃ।
ক্ষীরং সশর্করং পথ্যং যদ্বা সাত্ম্যঞ্চ সর্ব্বদা॥

অর্থাৎ—খণ্ড যুক্ত (খাঁড় গুড়যুক্ত) দুগ্ধ কফকারক ও বায়ুনাশক। চিনি ও মিশ্রিযুক্ত দুগ্ধ শুক্রকারক এবং ত্রিদোষনাশক গুড়যুক্ত দুগ্ধ মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক এবং শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকারক। শর্করাযুক্ত দুগ্ধ পথ্য এবং তাহা সর্ব্বদাই সাত্ম্য [দেহানুকূল]।

সন্তানিকা বা দুধের সর।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও দুগ্ধের সর সম্বন্ধে ২। ১টী প্রয়োজনীয় কথা এখানে বলা যাইতেছে। দুগ্ধের সরকে সংস্কৃত ভাষায় সন্তানিকা বা পয়শ্ছদ বলা যায়। দুগ্ধ ভাল রকম জ্বাল দিয়া শীতল ও নির্ব্বাত স্থানে রাখিয়া দিলে তদুপরি যে আবরণ জন্মে তাহাকেই সর বলা হয়। ইহার গুণ ভাব প্রকাশে এই প্রকার কথিত হইয়াছে—

"সন্তানিকা গুরু শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্রবাতনুৎ।
তর্পণী বৃংহণী স্নিগ্ধা বলাল বলশুক্রলা॥"

সান্তানিকা (সর) গুরুপাক, শীতবীর্য্য, বৃষ্য, রক্তপিত্ত ও বাতনাশক ; ইহা তৃপ্তিকারক, বৃংহণী [পুষ্টিকারক] স্নিগ্ধ, বলকারক, এবং শুক্র-বৃদ্ধিকারক।

মাহিষ দুগ্ধের সর অতি শুভ্র ও পুরু হয় এবং ইহাতে নবনীতের ভাগও অধিক থাকে। দুগ্ধের সরদ্বারা নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত সরপুরিয়া এবং সরভাজা

তাহার নিদর্শন। ২ | ৩ দিনের সর একত্রিত করিয়া জ্বাল দিলে অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত প্রস্তুত হয়। সর, বালকের পক্ষে দুষ্পাচ্য এবং অনিষ্টজনক।

সর পাতার দুগ্ধ একটু ঘনাবর্ত্তিত হওয়া চাই এবং যে পাত্রে সর পাতিতে হইবে, তাহার মুখ কিছু বিস্তৃত (চেপ্টা) হওয়া চাই। যে ঘরে সর পাতা দুগ্ধ রাখিতে হইবে, তাহা নির্জ্জন এবং নির্ব্বাত হওয়া আবশ্যক। পুনঃ পুনঃ সেই ঘরে লোক যাতায়াত করিলে বায়ু চালিত হইয়া এবং তাপের অবস্থা (temperature) পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া সর জমার পক্ষে বিঘ্ন হইবে। গ্রীষ্ম-কালে দিবাভাগে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া না রাখিলে ভাল সর জন্মে না। কিন্তু রাত্রিতে দরজা খুলিয়া রাখা ভাল, শৃগাল ইত্যাদি ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য ঘরে ছিদ্রযুক্ত কবাট ব্যবহার করাই ভাল। সর জমার পক্ষে শীতল দিনই প্রশস্ত। মেঘাচ্ছন্ন দিনে এবং পশ্চিম দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে সর পাতলা হয়। স্থূল কথা মেঘশূন্য, নির্ম্মল ও নির্ব্বাত দিনই সর পাতার পক্ষে উপযোগী। তুষারপাত আরম্ভ হইলেও ভাল সর জন্মে না।

---

(২৪)

দুগ্ধের বিবিধ অবস্থার সংজ্ঞা-ভেদ এবং তত্তদবস্থার আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুণাদি ঃ

আয়ুর্ব্বেদে দুগ্ধের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এবং তত্তদবস্থার গুণাদিও কথিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশোক্ত মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"ক্ষীরং তৎকালসূতায়া ঘনং (১) পেযূষ (পীযূষ) মুচ্যতে।

(পেযূষং "ফেনসা" ইতি লোকে)————

নষ্ট দুগ্ধস্য পক্কস্য পিণ্ডঃ প্রোক্তঃ (২) কিলাটকঃ ॥

(কিলাটকঃ—গিজরী ছানা বা ইতি লোকে)

অপক্কমেব যন্নষ্টং (৩) ক্ষীবসাকং হি তৎ পযঃ।

(খরিসা ইতি লোকে—জালা দুধ্ ইতি ভাষা)

দধ্না তক্রেণ বা নষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা।

দ্রব ভাগেন হীনং যৎ (৪) তক্রপিণ্ডঃ স উচ্যতে ॥

নষ্ট দুগ্ধ ভবন্নীরং (৫) মোরটং জেজ্জড়েহব্রবীৎ।

পেযূষশ্চ কিলাটশ্চ ক্ষীরসাকং তথৈবচ।

তক্র পিণ্ড ইমে বৃষ্যা বৃংহণা বলবর্দ্ধকাঃ ॥

গুববঃ শ্লেষ্মলা হৃদ্যা বাতপিত্তবিনাশনাঃ।

দীপ্তাগ্নিনাং বিনিদ্রাণাং ব্যবায়ে চাতি পূজিতাঃ ॥

মুখ শোষ তৃষা দাহ রক্ত পিত্তজ্বর প্রণুৎ।

লঘুর্বলকরো রুচ্যো মোরটঃ স্যাৎ সিতাযুতঃ ॥

অর্থাৎ—তৎকাল-প্রসূতা (সদ্য-প্রসূতা) গাভীর গাঢ় দুগ্ধকে (১) পেয়ূষ অথবা পীযূষ বলা যায়। ইহাকে প্রচলিত ভাষায় ফেংসা বলে। ইংরেজী ভাষায় ইহাকে Colstrum বলে। নষ্ট দুগ্ধ (জালা দুধ) জ্বাল দিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করিলে তাহাকে (২) কিলাটক বলা যায় (প্রচলিত ভাষায় ইহার নাম ছানা বা গিজ্‌রী)। অপক্ব অবস্থায় দুগ্ধ (কাঁচা দুধ) নষ্ট হইয়া গেলে তাহাকে (৩) ক্ষীরসাক বলা হয়। (প্রচলিত ভাষায় ইহার নাম খরিসা বা জালাদুধ)। দধি অথবা ঘোল সংযোগে দুগ্ধ নষ্ট করতঃ তাহা ভাল কাপড়ে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া নির্জল অবস্থায় পরিণত করিলে (৪) তক্রপিণ্ড সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় (ইহাকে প্রচলিত ভাষায় ছাঁকা দেওয়া দই বলে)।

নষ্ট দুগ্ধ ছাঁকা দিলে যে জল নির্গত হয়, তাহাকে ভেজ্জড় (৫) মোরট সংজ্ঞা দিয়াছেন।

পেয়ূষ, কিলাটক, ক্ষীরাসক এবং তক্রপিণ্ড. বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক) বৃংহণ (পুষ্টিকারক) ও বলবর্দ্ধক। এ সমুদয় গুরু, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, হৃদ্য ও বাতপিত্তনাশক। দীপ্তাগ্নি, বিনিদ্র (নিদ্রাহীন) ও অতি মৈথুনকারীর পক্ষেও এগুলি হিতজনক। মিশ্রিযুক্ত মোরট লঘু, বলকারক, রুচিজনক, মুখশোষ, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক।

(২৫)

শারীরিক অবস্থাভেদে দুগ্ধ ব্যবহারের ফলাফল এবং আয়ুর্ব্বেদোক্ত দুগ্ধের আময়িক (ঔষধার্থ) প্রয়োগ।

নির্ঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে ;—

বাল্যে বহ্নিকরং ততো বলকরং বীর্য্যপ্রদং বার্দ্ধকে।

(দুগ্ধ) বাল্যে অগ্নিবৃদ্ধিকর, তৎপর (যৌবনে) বলকারক এবং বার্দ্ধক্যে বীর্য্যকারক হইয়া থাকে।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে ;—

"বালে বৃদ্ধিকরং ক্ষয়েঽক্ষয়করং বৃদ্ধেষু রেতোবহম্।"

দুগ্ধ বাল্যে বৃদ্ধিকারক, ক্ষয়ে ক্ষয়নাশক এবং বৃদ্ধের পক্ষে শুক্র-বৃদ্ধিকারক।

নিঘণ্টুতে আরও কথিত হইয়াছে ;—

"জীর্ণ জ্বরে কিন্তু কফে বিলীনে,
স্যাদ্দুগ্ধ পানং হি সুধা সমানম্।
তদেব পীতং তরুণে জ্বরে চ
নিহন্তি হলাহলবন্মনুষ্যম্॥"

অর্থাৎ—কফ বিলীন হইলে জীর্ণজ্বরে দুগ্ধ পান সুধাসম হয় ; কিন্তু তাহা তরুণজ্বরে (জ্বরের প্রথম অবস্থায়) মনুষ্যকে বিষবৎ হনন করিয়া থাকে (অর্থাৎ তরুণ জ্বরে দুগ্ধপান অত্যন্ত অনিষ্টজনক)।

অপিচ—

"নবজ্বরে মন্দাগ্নৌহ্যাম দোষেষু কুষ্ঠিনাং
শূলিনাং কফ দোষেষু কাসিনামতিসারিনাম্ ॥
পয়ঃ পানং নকুর্ব্বীত বিশেষাৎ কৃমিদোষতঃ ॥"

অপিচ—নবজ্বরে, মন্দাগ্নিতে, আমাশয়ের পীড়াতে, কুষ্ঠরোগে, শূলরোগীর পক্ষে, কফদোষে, কাস ও অতিসার রোগে দুগ্ধ পান করিবে না। কৃমিদোষে দুগ্ধপান বিশেষ প্রকারে নিষিদ্ধ।

ভাবপ্রকাশে কথিত হইয়াছে ;—

"দীপ্তানলে কৃশে পুংসি বালে বৃদ্ধে পয়ঃ প্রিয়ে
মতং হিততমং দুগ্ধং সদ্যঃ শুক্রকরং যতঃ ॥"

অর্থাৎ—দুগ্ধ সদ্য শুক্র-বৃদ্ধিকর, ইহা দীপ্তাগ্নি, কৃশ, বৃদ্ধ এবং দুগ্ধপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে হিততম বলিয়া জানিবে।

উক্ত গ্রন্থে আরও কথিত হইয়াছে ;—

"জীর্ণজ্বরে মনোরোগে শোষে মূর্চ্ছাভ্রমেষু চ।
গ্রহণ্যাং পাণ্ডুরোগে চ দাহে তৃষি হৃদাময়ে ॥
শূলোদাবর্ত্তে গুল্মেষু বস্তিরোগে গুদাঙ্কুরে।
রক্তপিত্তাতিসারে চ যোনি রোগে শ্রমে ক্লমে।
গর্ভস্রাবে চ সততং হিতং মুনিবরৈঃ স্মৃতম্ ॥
বালবৃদ্ধ ক্ষত ক্ষীণাঃ ক্ষুদ্ব্যবায় কৃশাশ্চয়ে।
তেভ্যঃ সদাতিশায়িতং হিতমেতদুদাহৃতম্ ॥"

অর্থাৎ—দুগ্ধ জীর্ণজ্বরে, উন্মাদাদি মানসিক রোগে, শোষে, মূর্চ্ছা ও ভ্রমরোগে, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগে, দাহ, পিপাসা, হৃদ্‌রোগ, শূল, উদাবর্ত্ত (ঊর্দ্ধগত বায়ুজনিত রোগ এবং তজ্জনিত মল-মূত্রাদি রোধ) গুল্ম, বস্তিরোগ, অর্শ, রক্তপিত্ত. অতিসার, যোনি-রোগ, শ্রম, ক্লম, গর্ভস্রাব, এই সকল রোগে দুগ্ধ সর্ব্বদাই হিত-জনক। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষতক্ষীণ রোগগ্রস্ত, ক্ষুধাতুর ও মৈথুন বশতঃ কৃশ ব্যক্তিগণের পক্ষে দুগ্ধ অতিশয় হিতজনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গহৃদয়ে কথিত হইয়াছে ;—

"শ্রম ভ্রম মদালক্ষ্মী কাসশ্বাসাতি তৃট্‌ক্ষুধঃ।
জীর্ণজ্বরং মূত্রকৃচ্ছ্রং রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ॥"

দুগ্ধ, শ্রম, ভ্রম, মদ, অলক্ষ্মী, কাস, শ্বাস, অতিতৃষ্ণা, ক্ষুধা, জীর্ণজ্বর, মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তপিত্ত নাশ করে।

সুশ্রুত-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে ;—

"সর্ব্বমেব ক্ষীরং বাতপিত্ত শোণিত মানস বিকারেষ্ববিরুদ্ধং জীর্ণজ্বর কাস শ্বাস শোষ ক্ষয় গুল্মোন্মাদোদর মূর্চ্ছাভ্রমমদ দাহ পিপাসা হৃদ্‌বস্তি পাণ্ডুরোগ গ্রহণী দোষার্শঃ শূলোদাবর্ত্তাতিসার প্রবাহিকা যোনিরোগ রক্তপিত্ত শ্রমক্লমহরং, পাপ্মাপহং বৃষ্যং বাজীকরণং রসায়নং মেধ্যং সন্ধানমাস্থাপনমায়ুষ্যং জীবনং বৃংহণং বমন বিরেচনঞ্চ তুল্যগুণত্বাচ্চৌজসোবর্দ্ধনমিতি, বালবৃদ্ধ ক্ষত ক্ষীণানাং ক্ষুদ্‌ব্যবায় ব্যায়ম কর্শিতানাঞ্চ পথ্যতমম্।"

অর্থাৎ—সর্ব্বপ্রকার দুগ্ধই বাত, পিত্ত, রক্ত ও মনোবিকার সমূহে অবিরুদ্ধ এবং জীর্ণজ্বর, কাস, শ্বাস, শোষ, ক্ষয়, গুল্ম, উন্মাদ, উদর, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মদ, দাহ, পিপাসা হৃদ্‌রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীদোষ, অর্শ, শূল, উদাবর্ত্ত (ঊর্দ্ধগ বায়ুজনিত রোগ এবং তজ্জনিত মল মূত্র ও বায়ু রোধ)। অতিসার, প্রবাহিকা (রক্তামাশয়) যোনিরোগ, গর্ভস্রাব, রক্তপিত্ত, ভ্রম ও ক্লমনাশক। ইহা (দুগ্ধ) পাপনাশক, বলকারক, বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক) বাজীকরণ (রতিশক্তিবর্দ্ধক) রসায়ন (জরাব্যাধিনাশক) মেধ্য (পবিত্র) সন্ধানস্থাপক (ভগ্ন-সংযোজক) বয়ঃস্থাপক, আয়ুষ্য (আয়ুবৃদ্ধিকর); জীবনীয়, বৃংহণ (পুষ্টিকারক) বমনোপগ (বমনের উপযোগী) বিরেচনোপযোগী ও ওজোধাতুর তুল্য গুণত্ব হেতু ইহা ওজোধাতুবর্দ্ধক ; ইহা বালক, বৃদ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ক্ষুধাতুর ব্যবায়ক্ষীণ (মৈথুনজনিত ক্ষীণ) ব্যায়ামক্ষীণদের পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ্য।

(১৬)

কি কি প্রকার গাভীর দুগ্ধ অনিষ্টজনক ও বর্জ্জনীয় এবং দুগ্ধে সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্যাদি।

(আয়ুর্ব্বেদোক্ত)

পাশ্চাত্য মতে প্রসূতা গাভী পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইবার অব্যবহিতপূর্ব্বে এবং বৎস প্রসবের কিছু পূর্ব্বাহ্ণে যে দুগ্ধ প্রদান

করে তাহা শিশুর পক্ষে অনিষ্টজনক। সদ্যপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ বর্জ্জনীয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে প্রসবের পর ৩। ৪ দিন পর্য্যন্ত গাভী যে দুগ্ধ দেয়, তাহাকে Colstrum (কলষ্ট্রাম) বলে; প্রচলিত ভাষায় ইহার নাম (মাতলা দুধ) ইহা মানবের ব্যবহারোপযোগী নহে; কিন্তু গোবৎসের পক্ষে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়, কেননা জরায়ুতে অবস্থানকালে বৎসের মল মূত্রাদি বদ্ধ থাকে. এই কলষ্ট্রম্ সেবনে তাহার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, যেহেতু ইহা বিরেচক। অধিক মাত্রায় সেবনে অনিষ্ট সম্ভাবনা।

কলষ্ট্রমের রাসায়নিক উপাদানের অনুপাত নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

			প্রথম দিন শতাংশে		গড়ে
1.	Fat	(চর্ব্বী)	৮'৫	...	৪'০
2.	Albumin	(শ্বেতসার)	১৫'৫	...	৭'৫
3.	Casein	(ছানা)	১১'২	...	৭ ৩
4.	Sugar	(শর্করা)	০'০	...	৩'০
5.	Ash	(অঙ্গার)	৩'৩	...	১'০
			৩৮'৫		২২'৮

উপরোক্ত রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যায় যে, প্রসবান্তে প্রথম দিনের কলষ্ট্রামে শর্করার ভাগ একবারে শূন্য; ক্রমে তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৩'০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কলষ্ট্রামের প্রথমাংশে চর্ব্বী, ছানা, শ্বেতসার এবং অঙ্গারের অংশ অত্যন্ত অধিক

থাকে এবং ক্রমে সে সমুদয়ের অম্লত্ব হয়; এই সমস্ত পদার্থ বৎসের লালার সহিত যুক্ত হইয়া সহজে জীর্ণ হয়। সাধারণতঃ গোদুগ্ধ ৯র্থ হইতে ১১শ দিবসে স্বাভাবিক ও বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু এই সময়টী সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট থাকে না। গাভীর জাতি, স্বাস্থ্য, দৈহিক বল, আহার বিহার ও প্রতিপালন ইত্যাদি নানা কারণে ইহার ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। প্রসবান্তে ৩। ৪ দিবস পর কলষ্ট্রম, চা কাফি ইত্যাদির সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং ইহাতে মাখনও প্রস্তুত হয়। প্রসবান্তে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত গো-দুগ্ধ ব্যবহার না করা শ্রেয়ঃ। আমাদের শাস্ত্রানুসারে প্রসবান্তে নারী, গো, মহিষী ও ছাগী দশদিনে শুদ্ধ হয়, অতএব ১০ দিন পর্য্যন্ত নবপ্রসূতা গাভী ইত্যাদির দুগ্ধ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

ইহার প্রমাণ—

"অজা গাবো মহিষাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ প্রসূতিকাঃ।
দশ রাত্রেণ শুদ্ধ্যন্তি ভূমিস্থঞ্চ নবোদকম্॥

নবপ্রসূতা নারী, গাভী, মহিষী ও ছাগী প্রসবান্তে দশ দিনে শুদ্ধা হয়; বৃষ্টির জল ভূমিষ্ঠ হওযার পর দশ রাত্রিতে শুদ্ধ হয়।

বিবৎসা, বালবৎসা, মৃতবৎসা, রুগ্না, অতি বৃদ্ধ, দুর্ব্বলা এবং সন্ধ্যষণ্ডসংযুক্তা গাভীর দুগ্ধ ব্যবহার না করাই উচিত।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"দুর্ব্বলা ব্যাধিসংযুক্তা পুষ্পিতা যা দ্বিবৎসভূঃ।
সা সাধুভির্ন দোগ্ধব্যা বণিভিঃ সুখমীপ্সুভিঃ॥"

অর্থাৎ—দুর্ব্বলা, রুগ্না, ঋতুমতী এবং দ্বিবৎসযুক্তা গাভীকে সুখাভিলাষী বর্ণাশ্রমী সাধুগণ দোহন করিবেন না (তাহার দুগ্ধ পান করিবে না)।

আজকাল বিবৎসা গাভীকে ফুঁকা দিয়া দোহন করা হয়, এটা অতি নিষ্ঠুর প্রথা, এই উপায়লব্ধ দুগ্ধ বর্জনীয়। কঠোর রাজবিধি দ্বারা এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত হওয়া কর্ত্তব্য। বাজার হইতে আনিত দুগ্ধ নানা দোষযুক্ত, অতএব তাহাও ব্যবহার না করিতে পারিলেই ভাল কিন্তু তাহা সর্ব্বদা সম্ভবপর নহে। অনাবৃত অবস্থায় রক্ষিত দুগ্ধও জ্বাল না দিয়া ব্যবহার করা অনুচিত, এবিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে ভাদ্র মাসে প্রসূতা ও ঐমাসে গর্ভবতী গাভীর দুগ্ধ ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে যথা :—

"সিংহে প্রসূতা যা গাভী সিংহে গর্ভধরা চযা।
দধি বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং ঘৃতঞ্চ মদিরা সমম্॥"

ভাদ্র মাসে প্রসূতা ও সেই মাসে গর্ভবতী গাভীর দুগ্ধ মূত্র তুল্য এবং তজ্জাত দধি বিষ্ঠাসম এবং ঘৃত মদিরা তুল্য, অতএব পরিত্যজ্য। এই নিষেধের মূলে কোনও নিগূঢ় কারণ আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া মহাজন-বাক্যে উপেক্ষা করা সমীচান নহে। কৃতবিদ্যগণ সত্যাবিষ্কারের চেষ্টা করুন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে—

ভাবপ্রকাশোক্তে—

বালবৎসা বিবৎসানাং গবাং দুগ্ধং ত্রিদোষকৃৎ।

ক্ষীরং তৎকাল সূতায়া ঘনং পেয়ুষ মুচ্যতে॥

পীযুষমিতি পাঠান্তরম্————।

অর্থাৎ—বালবৎসা ও বিবৎসা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষজনক। তৎকাল প্রসূতা (সদ্য প্রসূতা) গাভীর দুগ্ধ ঘন থাকে। ইহাই পেয়ূষ—(পীযূষ) বলা যায়। প্রসূতায়া গোঃ সপ্তাহং যাবৎ যৎক্ষীরং তৎ পীযূষমাহুঃ—প্রসূতা গাভীর দুগ্ধকে এক সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত পীযূষ অথবা পেয়ূষ বলা যায়।

ভাবপ্রকাশে আরও কথিত হইয়াছে—

"বিবর্ণং বিরসং চাম্লং দুর্গন্ধং গ্রথিতং পয়ঃ।

বর্জয়েদম্ল লবণযুক্তং কুষ্টাদিকৃৎ যতঃ॥

রাজ নির্ঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে;—

"অনিষ্ট গন্ধমম্লঞ্চ বিবর্ণং বিরসঞ্চ যৎ।

বর্জ্জ্যং সলবণং ক্ষীরং যচ্চ বিগ্রথিতং ভবেৎ॥

অর্থাৎ—বিবর্ণ, বিরস, অম্ল-স্বাদযুক্ত, দুর্গন্ধা এবং গ্রথিত (জমাটবাঁধা) দুগ্ধ বর্জনীয়। অম্ল ও লবণযুক্ত দুগ্ধ কুষ্ঠ রোগজনক, অতএব তাহাও বর্জনীয়।

নির্ঘণ্টুতে আরও কথিত হইয়াছে—

"স্নিগ্ধং শীতং গুরু ক্ষীরং সর্ব্বকালং নসেবয়েৎ।

দীপ্তাগ্নিং কুরুতে মন্দং মন্দাগ্নিং নষ্ট মেবচ॥"

অর্থাৎ—স্নিগ্ধ, শীতল এবং ঘন দুগ্ধ সর্ব্বদা সেবন করিবে না, কারণ ইহাতে দীপ্তাগ্নি মন্দীভূত হয় এবং মন্দাগ্নি একেবারে নষ্ট হয়।

রাজ নির্ঘণ্টুতে ইহাও কথিত হইয়াছে যে—

তাসাং মাস ত্রয়াদূর্দ্ধং গুর্ব্বিণীনাং যৎপয়ঃ।
তদ্দাহি লবণং ক্ষীরং মধুরং পিত্তদোষকৃৎ॥

তাহাদের মধ্যে তিন মাসের উর্দ্ধকালের গর্ভিণী গাভীর দুগ্ধ বিদাহী, লবণ-স্বাদযুক্ত, মধুর এবং পিত্তদোষকারক।

সম্প্রতি দুগ্ধের সহিত সংযোগ-বিরুদ্ধ পদার্থাদি বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদোক্ত মত গুলি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

নির্ঘণ্টুতে কথিত হইয়াছেঃ—

" * * * * নচৈতল্লবণেন সার্দ্ধং
পিষ্টান্ন সন্ধানক মাষ মুদ্গা কোশাতকী কন্দফলাদিকৈশ্চ॥

অপিচ—মৎস্য মাংস গুড় মুদ্গ মূলকৈঃ কুষ্ঠমাবহতি সেবিতং পয়ঃ। শাকং জাম্বর রসৈস্তু সেবিতং মারয়ত্যবুধমাশু সর্পবৎ।

অর্থাৎ—ইহা (দুগ্ধ) লবণ সংযুক্ত করিয়া চালের গুঁড়ির সহিত এবং সন্ধানক (আমের আচার) মাষ, মুগ, কোশাতকী (ঝিঙা, পলতা, ধুন্দুল, পটল) এবং কন্দফলের (মূলা ইত্যাদির) সহিত সেবন করিবে না। অপিচ মৎস্য, মাংস, গুড়, মুগ এবং মূলার সহিত দুগ্ধ সেবন করিলে কুষ্ঠ রোগ জন্মে। শাক, জামের রস দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে তাহা মূর্খ ব্যক্তিকে সর্পবৎ বিনাশ করে।

সুশ্রুত সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

"নব বিরূঢ় ধান্যৈর্বসামধু পয়োগুড় মাষৈর্ব্বা গ্রাম্যানূপৌক পিশিতাদীনি নাভ্য ব্যহরেৎ। ন পয়ো মধুভ্যাং রোহিণী শাকং জাতু শাকং বাশ্নীয়াৎ। ক্ষীরেণ মূলকং আম্র জাম্ববশ্বাবিচ্ছুকর গোধাশ্চ সর্ব্বাংশ্চ মৎস্যান্, বিশেষেণ চিলিচিমং পয়সা কদলীফলং লকুচ ফলং। লকুচ ফলং প্রাক্‌পয়সঃ পয়সোঽন্তেবা বিরুদ্ধম্। উক্তঞ্চ সংযোগতস্তপরাণি বিষতুল্যানি,—তদ্‌যথা বল্লীফল কবক করীরাম্মফল লবণ কুলত্থ পিণ্যাক দধি তৈল বিরোহি পিষ্ট শুষ্ক শাকাজাবিক মাংস মদ্য জাম্বব চিলাচিম মৎস্য গোধা বারাহাশ্চ নৈকধ্য মশ্নীয়াৎ পয়সা" অর্থাৎ—অভিনব অঙ্কুরিত ধান্যের সহিত অথবা বসা, মধু, দুগ্ধ, গুড় ও মাষ কলায়ের সহিত গ্রাম্য জন্তুর মাংস, আনূপ জন্তুর (সজলদেশবাসী জন্তুর—মহিষ প্রভৃতির) মাংস ভক্ষণ করিবে না। দুগ্ধ ও মধুর সহিত রোহিণী শাক (কটুকীশাক), জাতুশাক (পুষ্কর শাক), ভক্ষণ করিবে না। দুগ্ধের সহিত মূলা আম্র, জাম, সজারু ও শূকর মাংস ভক্ষণ করিবে না। এবং গোধা (গোসাপ) মাংস, কদলী (কলা) ও লকুচ (ডহুয়া) ফলের সহিতও দুগ্ধ সেবন করিবে না। ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, দুগ্ধের সহিত সর্ব্ব প্রকার মৎস্য (বিশেষতঃ চিলাচিম্ অর্থাৎ খরসল্লা মাছ) ভক্ষণ বিরুদ্ধ। দুগ্ধ পানের পরে অথবা পূর্ব্বেও লকুচ ফল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। আরও কথিত হইয়াছে যে, অপর কতকগুলি দ্রব্য সংযোগে দুগ্ধ বিষতুল্য

হয়, যথা—বল্লীফল, (কুমড়া, লাউ প্রভৃতি লতাফল) কবক (ছাতনা mushroom), করীর (বংশাঙ্কুর), অম্লফল (তেঁতুল), লবণ, কুলথ (কলাই), পিণ্যাক (পিষ্টতিল), দধি, তৈল বিরোহী (যে সকল শাকের অঙ্কুর নিবৃত্ত হইয়াছে), চালের পিঠা, শুষ্ক শাক, ছাগ ও মেষমাংস, জামের রস, মদ্য, চিলচিম্ মৎস্য (চরকসংহিতা মতে সর্ব্ব প্রকার মৎস্য), গোধা (গোসাপ) ও শূকর মাংস দুগ্ধের সহিত একত্র ভক্ষণ করিবে না।

সুশ্রুতে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, যাহাদের অভ্যাস আছে এবং পরিমাণে অল্প হইলে বহুভোজীর পক্ষে, দীপ্তাগ্নির পক্ষে (যাহাদের ক্ষুধা প্রবল), প্রবল পরিপাক-শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে, ব্যায়ামকারী ও তরুণ বয়স্ক এবং স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি সেবনকারী ব্যক্তির পক্ষে, সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্যাদি তত অনিষ্টজনক নহে। ফলতঃ সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্যাদি একটু বিবেচনা করিয়া এবং দৈহিক অবস্থাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভক্ষণ করাই শ্রেয়ঃ। অষ্টাঙ্গ হৃদয়, চরক প্রভৃতি গ্রন্থেও সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্যাদির উল্লেখ আছে, বাহুল্য ভয়ে সে সমুদয় উদ্ধৃত হইল না। কুতূহলী পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে উক্ত গ্রন্থগুলি দেখিতে পারেন।

---

(২৭)

গোদুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব,* যন্ত্রাদির সাহায্যে ও অন্যান্য উপায়ে দুগ্ধ পরীক্ষা এবং তাহার ফলাফল ঃ

সমতাপ ও সমান চাপযুক্ত, সমায়তন বিশিষ্ট পরিষ্কৃত জলের গুরুত্বের সহিত কোন পদার্থের গুরুত্বের আনুপাতিক সম্বন্ধকে সেই পদার্থের "আপেক্ষিক গুরুত্ব" (Specific gravity) বলা যায়। ফারণহিটের তাপমান যন্ত্রের ৫৯° ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড স্কেলের তাপমানের ১৫° ডিগ্রীর তুল্য) উত্তাপবিশিষ্ট পরিশ্রুত (Distilled water) চোয়ান জলের সহিত সম-তাপবিশিষ্ট, সমায়তন, অকৃত্রিম গোদুগ্ধের গুরুত্বের অনুপাতকে তাহার (গোদুগ্ধের) আপেক্ষিক গুরুত্ব বলা যায়; ইহা ১.০২৯ (1.029) হইতে ১.০৩৩ (1.033) পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ৫৯° ডিগ্রী (ফাঃ হিট) পরিমাণ উত্তাপবিশিষ্ট ১০০০ আউন্স পরিশ্রুত জলের সহিত, সমায়তন ও সমতাপবিশিষ্ট খাঁটি গোদুগ্ধের ওজন ১০২৯ হইতে ১০৩৩ আউন্স পর্য্যন্ত হয়। গোদুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্ব্বোচ্চে ১.০৩৫ (1.035) এবং সর্ব্বনিম্নে ১.০২৭ (1.027) পর্য্যন্ত হইতে পারে। গাভীর জাতি, বয়স, আহার বিহার ও স্বাস্থ্যাদির উপর এই আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিবর্ত্তন নির্ভর করে।

---

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ J. Oliver প্রণীত Milk Cheese and Butter গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

দুগ্ধ পরীক্ষার জন্য (1) Lactometer (লেকটমিটার), (2) Hydrometer (হাইড্রোমিটার (3) Creamometer (ক্রিমোমিটার) ও (4) Lactoscope (লেকটোস্কোপ) প্রভৃতি যন্ত্র এবং Litmus paper (লিটমস্ পেপার) নামক এক প্রকার নীল বর্ণের কাগজ ব্যবহৃত হয়; ইহা ঔষধালয়ে (Dispensaryতে) পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ Lactometer (লেক্টোমিটার) যন্ত্রদ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষার বিষয় বলা যাইতেছে। ইহা নিম্নভাগে গোলাকৃতি-বিশিষ্ট একটী কাচের নল ভিন্ন আর কিছুই নহে; গোলাকৃতি অংশে পারদপূর্ণ থাকে এবং নলের গাত্রে পরিমাণের চিহ্ন কৃষ্ণ-রেখা থাকে (Graduated scale থাকে)। যে দুগ্ধ পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা ফাঃ হিটের তাপমান যন্ত্রের ৮০° ডিগ্রী উত্তাপবিশিষ্ট হওয়া চাই। এই প্রকার দুধ একটী চোঙ্গার মত কাচ-পাত্রে পূর্ণ করতঃ তাহাতে লেক্টোমিটার যন্ত্র নিমজ্জিত করিলে যদি নলটী M চিহ্ন পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকে, তবে দুগ্ধ খাঁটি বলিয়া অনুমান করিতে হইবে। এস্থলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যন্ত্রটী দুধে নিমজ্জিত করার পূর্ব্বে তাহা (দুধ) বেশ শীতল হওয়া আবশ্যক। দুধে এক ভাগ জল মিশ্রিত করিলে নলটী "৩" অঙ্ক পর্য্যন্ত থাকিবে। অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুধ মিশ্রিত করিলে "২" অঙ্ক পর্য্যন্ত এবং তিন ভাগে জল ও এক ভাগ দুধ মিশাইলে নলটী "১" অঙ্ক পর্য্যন্ত নিমজ্জিত থাকিবে।

কেবল জল হইলে নলটী W চিহ্ন পর্য্যন্ত ডুবিয়া থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র আপেক্ষিক গুরুত্ব-নির্ণায়ক; অতএব দুধে জল মিশ্রিত থাকিলেও তাহাতে শর্করা ময়দা প্রভৃতি যোগ করিলে ইহ দ্বারা কৃত্রিমতা নিরুপণ করা দুরূহ।

দ্বিতীয়তঃ—Hydrometer (হাইড্রোমিটার) যন্ত্র-সাহায্যে দুধ পরীক্ষার বিষয় বলা যাইতেছে। ইহাও পরিমাপের চিহ্নযুক্ত কাচের নল ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং ইহারও নিম্নভাগে পারদ থাকে, এবং এটীও আপেক্ষিক গুরুত্বনির্ণায়ক। এই যন্ত্র পরীক্ষণীয় দুধে নিমজ্জিত করিলে খাঁটি দুধ হইলে ৩০° ডিগ্রী জ্ঞাপিত হইবে, যন্ত্রে ১০৩০ লিখা থাকে, কারণ জলকে ভিত্তিস্বরূপ (Standard) কল্পনা করতঃ তাহা ১০০০ সংখ্যা সূচক ধরিয়া যন্ত্রের গাত্রে ০ (শূন্য) চিহ্ন দেওয়া হয়; অতএব ৩০° ডিগ্রী প্রকৃত প্রস্তাবে ১০৩০। খাঁটি দুধ ১০৩২ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, নিষ্কৃত্রিম গোদুগ্ধের Specefic gravity (আপেক্ষিক গুরুত্ব) ১০৩০ হইতে ১°০৩২ পর্য্যন্ত হয় এ বিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

ফারনহিটের তাপমান যন্ত্রের ৬০° ডিগ্রী উত্তাপযুক্ত দুধে (গোদুগ্ধে) শতাংশে দশ ভাগ করিয়া জল মিশাইলে দুধের গুরুত্ব "৩" ডিগ্রী হিসাবে কম হইতে থাকে।

শতকরা ১৫ ভাগ জল মিশাইলে দুধ হাইড্রমিটারে ২৬° ডিগ্রী হয়; যন্ত্রে ১০২৪ লিখা থাকে।

শতকরা ২০ ভাগ জল মিশাইলে ২৩° ডিগ্রী হয় (যন্ত্রে ১০২৩°)

„ ৩৫—„—„—১৮°—„—(যন্ত্রে ১০১৮°)

„ ৪৫—„—„—১৫°—„—(যন্ত্রে ১০১৫°)

দুগ্ধের নবনীত উঠাইয়া তাহাতে জল মিশ্রিত করিলে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব উচ্চ হইবে এবং নবনীতের ভাগ অধিক থাকিলে তাহা নিম্ন হইবে।

তৃতীয়তঃ—Creamometer (ক্রিমোমিটার) যন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষ সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। এই যন্ত্রটী দুগ্ধে নবনীতের পরিমাণ নির্ণায়ক। এটীও ডিগ্রী-চিহ্নযুক্ত কাচের চোঙ্গা ; এটী একটী কাঠের ফ্রেমে আবদ্ধ থাকে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দুগ্ধ দ্বারা এই নল পূর্ণ করতঃ যন্ত্রটী নির্ব্বাত ও নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দিলে ১২ ঘণ্টার পর দুগ্ধের সর নলের উপরি ভাগে ভাসিতে থাকিবে ; এস্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, দুগ্ধ নলে পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে উত্তপ্ত করিয়া নিতে হইবে। খাঁটি দুগ্ধে সরের স্থূলতা ৮ হইতে ১০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

Lactometer—(লেক্‌টোমিটার) এবং Hydrometer (হাইড্রোমিটার) যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষণীয় দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির করিয়া Creamometer (ক্রিমোমিটার) দ্বারা সেই দুগ্ধের সরের স্থূলত্ব অবধারণ করতঃ সর উঠাইয়া পুনর্ব্বার তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিলে দুগ্ধ পরীক্ষা সহজ হয় এবং তাহার গুণাগুণও কতকটা নিরূপিত হয়।

চতুর্থতঃ—Lactoscope (লেক্‌টোস্কোপ) যন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষা, এবিষয় বলার পূর্ব্বে Blue Litmus paper (নীলবর্ণের লিটমস্ পেপার) দ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষার বিষয় বলা যাইতেছে। এই কাগজ ডাক্তারখানায় সচরাচরই পাওয়া যায়। ইহার এক খণ্ড দুগ্ধে নিমজ্জিত করিলে যদি তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গাঢ় রক্ত বর্ণ হয় তবে, দুগ্ধ টকিয়া গিয়াছে (Acidity) হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে, এবং কাগজের বর্ণ অল্প গোলাপী আভাবিশিষ্ট হইলে দুগ্ধ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। দুগ্ধে চা খড়ি বা ময়দা মিশ্রিত থাকিলে কাগজের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইবে না। রুগ্না গাভীর দুগ্ধ ক্ষারপ্রধান (Alkaline), এবম্বিধ গো-দুগ্ধেও লিটমসের বর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে না। নারী দুগ্ধও ক্ষারপ্রধান ইহাতেও লিটমস্ পেপারের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় না। এতদ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে গোদুগ্ধ স্বভাবতই এসিডযুক্ত এবং এই জন্যই তাহাতে চুণের জল মিশাইয়া ক্ষারবিশিষ্ট করত শিশুকে ব্যবহার করান উচিত।

উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ সমবেত উপায়ে দুগ্ধের কৃত্রিমতা অনেকটা নির্ণয় করা যায় বটে, কিন্তু ইহার কোনটাই নিঃসন্দেহজনক নহে।

এখন Lactoscope (লেক্‌টোস্কোপ) যন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষার বিষয় বর্ণিত হইতেছে; এই যন্ত্র অনেকটা উন্নত ও নিঃসন্দেহজনক। এই যন্ত্রটী Munich (মিউনিচ) নগরবাসী Professor Feser (অধ্যাপক ফেছার) কর্ত্তৃক উদ্‌ভাবিত।

একথা প্রত্যক্ষ যে দুগ্ধ স্বভাবতঃ অস্বচ্ছ (Opaque), কিন্তু তাহার নবনীত উঠাইয়া জল মিশ্রিত করিলে ক্রমে স্বচ্ছ হয়, জলের পরিমাণ যত বৃদ্ধি করা যায় দুগ্ধের স্বচ্ছতাও ততই বাড়িতে থাকে। Lactoscope যন্ত্র উপরিভাগে অনাবৃত ও নিম্নভাগ ক্রমে সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট একটী কাচের নল, এই সূক্ষ্মাগ্র-ভাগে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ পরিমাপের রেখা চিহ্নবিশিষ্ট একটী কাচের শলাকা যুক্ত থাকে ; এই শলাকাটী চোঙ্গার মত। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পরীক্ষণীয় গোদুগ্ধ এই যন্ত্রে পূর্ণ করিলে প্রথমতঃ চিহ্ন রেখাগুলি দেখা যায় না, কিন্তু ঐ দুগ্ধ জল মিশাইতে আরম্ভ করিলে রেখাগুলি ক্রমে স্পষ্ট দেখা যায় ; তখন দেখিতে হইবে যে জল মিশ্রিত দুধে নলের উপরিভাগে কত উচ্চে অবস্থিত হইয়াছে, উচ্চতা নিরূপণ জন্য নলের গাত্রে ডিগ্রী চিহ্ন অঙ্কিত থাকে। এতদ্বারা দুধে কি পরিমাণ জল মিশ্রিত হইল এবং তাহাতে নবনীতের অংশইবা কত ইহা অতি সহজে নির্ণয় করা যায় ; কারণ জল মিশ্রণের অনুপাত অনুসারে দুধের স্বচ্ছতার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, দুধ পরীক্ষার যত প্রকার যন্ত্র এ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে Lactoscopeই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

যন্ত্রদ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষার বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল ; বৈজ্ঞানিক উন্নতি সহকারে দুগ্ধ পরীক্ষার উৎকৃষ্ট যন্ত্র আবিস্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত যন্ত্রাদি সাহায্যেই দুগ্ধ পরীক্ষা করিতে হইবে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দুগ্ধ পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিঃসন্দেহজনক, কিন্তু ইহা সকলের পক্ষে এবং সর্ব্বদা সম্ভবপর নহে। সাধারণতঃ ন্যূন পক্ষে খাঁটি গোদুগ্ধ শতকরা ৮'৬ অংশ Solid matter দৃঢ় পদার্থ যথা—ছানা শর্করা প্রভৃতি ২'৫ অংশ নবনীত ও ৮৮'৯ অংশ জলীয় পদার্থ থাকে। ইহার ব্যতিক্রমে দুগ্ধ কৃত্রিম বলিয়া মনে করিতে হইবে, ইহাকে ইংলণ্ডে Sumarset house standard (সমারসেট হাউস্ ষ্টেণ্ডার্ড) বলা যায় এবং ইহাই রাজবিধান অনুসারে গ্রাহ্য বলিয়া গণ্য হয়।

রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতীত অন্য কি কি উপায়ে দুগ্ধ পরীক্ষিত হইতে পারে তাহা দেখা যাউক। অকৃত্রিম উৎকৃষ্ট দুগ্ধ অতিশয় গাঢ় অথবা একেবারে তরল হয় না, এবং এমন সংহত হয় যে ইহার বিন্দু গুলি ছড়াইয়া যায় না ও এই প্রকার দুগ্ধের ফোঁটা মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিলে ছড়াইয়া পড়ে না। একটা সূক্ষ্ম সূচীর (ছুঁচের) অগ্রভাগ দুগ্ধ সংলগ্ন করিলে অকৃত্রিম দুগ্ধের বিন্দুটী ঝুলিয়া থাকিবে (পড়িয়া যাইবে না) দুগ্ধে জল মিশাইলে তাহা নীলাভ, Agate (এক প্রকার প্রস্তর) অথবা opal (শ্বেতবর্ণ প্রস্তর বিশেষ) বর্ণ হয় এবং তাহা মাটিতে ফেলাইলে ছড়াইয়া যায়। এতাদৃশ দুগ্ধ অতি সত্বর টক হইয়া যায় এবং মথিত করিলে তাহাতে ভাল নবনীত জন্মে না। এস্থলে একটী আবশ্যকীয় বিষয় বলা যাইতেছে।

অল্প দিন হইল যে সবৎসা দুগ্ধ-বতী গাভী গর্ভিণী হইয়াছে,

তাহার দুগ্ধ পরীক্ষার দ্বারা অনেক সময় সহজে পূর্ণগর্ভ সঞ্চার নির্ণয় করা যায়। যে গাভীটীকে পরীক্ষা করিতে হইবে তাহার অল্প পরিমাণ দুগ্ধ দোহন করতঃ অপর একটী গাভীর (যাহার গর্ভ সঞ্চার হয় নাই বলিয়া নিশ্চিত ভাবে জানা আছে) অল্প পরিমাণে দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া দুইটী খড় অথবা দুইটী ছুঁচ উভয় দুগ্ধে নিমজ্জিত করিতে হইবে। অতঃপর দুইটী কাচের গ্লাসে কিঞ্চিদুষ্ণ নির্ম্মল জল পূর্ণ করতঃ উভয় প্রকার দুগ্ধের এক একটী ফোঁটা তাহাতে নিক্ষেপ করিলে দেখা যাইবে যে গর্ভিণী গাভীর দুগ্ধ বিন্দুটী জলে মিশ্রিত হওয়ার পূর্ব্বে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে এবং অপর গাভীর (যেটী গর্ভিণী নহে) তাহার দুধ জলে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। গর্ভিণী গাভীর দুধ স্বভাবত গাঢ়, সংহত ও কিছু আটাল গুণযুক্ত হয় এবং এই জন্যই তাহা সহসা জলে মিশিয়া যায় না। প্রাতঃকালে গাভী দোহন করিয়া বৃষ্টির জলে অথবা পরিশ্রুত উষ্ণ জলে এবম্বিধ পরীক্ষা করা শ্রেয়ঃ।

দুধ ময়দাচূর্ণ কি অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে তাহার বর্ণ দেখিয়া ও জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন গ্রহণ করিয়াও নিরূপিত করা যায়। বাজারে বিক্রয়ার্থ আনীত দুধ প্রায়ই কৃত্রিম এবং নানা দোষযুক্ত থাকে, অতএব তাহা ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে নানা উপায়ে পরীক্ষা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। দুধের প্রাচুর্য্য না হইলে কঠোর রাজবিধি দ্বারাও দুধের কৃত্রিমতা নিবারিত হওয়া দুরূহ বলিয়া মনে হয়।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিশুদ্ধ ও দূষিত স্তন্যের লক্ষণ এবং স্তন্য দোষ নিবারণের উপায়।

চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে যে,—

"স্তন্য সম্পত্তু প্রকৃতি বর্ণ গন্ধ রস স্পর্শ মুদক পাত্রেচ দুহ্যমানং দুগ্ধ মেকং ব্যক্তি প্রকৃতি ভূতত্বাৎ তৎ পুষ্টিকরমারোগ্য-করঞ্চেতি; অতোন্যোথা ব্যাপন্নং জ্ঞেয়মিতি। তস্য বিশেষা:—

(১) শ্যাবারুণ বর্ণং কষায়ানুরসং বিশদ মনপেক্ষ্য গন্ধং রূক্ষং দ্রবং ফেনিলং লঘ্বতৃপ্তিকরং কর্ষণং বাত-বিকারাণাং কর্ত্তৃ বাতোপসৃষ্ঠং ক্ষীরমিতি জ্ঞেয়ম্।

(২) কৃষ্ণ নীল পীত তাম্রাবভাসং তিক্তাম্ল কটুকাম্ল রসং কুণপরুধিরগন্ধিভৃশোষ্ণঞ্চ পিত্ত বিকারাণাং কর্ত্তৃ পিত্তোপ সৃষ্টং ক্ষীরমিতিজ্ঞেয়ম্"।

(৩) অত্যর্থ শুক্লমধি মার্যোপপন্নং লবণানুরসং ঘৃত তৈল বসামজ্জাগন্ধি পিচ্ছিলং তন্তু মদুদকপাত্রে হবসীদতি শ্লেষ্মবিকারানাঞ্চ কর্ত্তৃ শ্লেষ্মোপসৃষ্টং ক্ষীরমিতি জ্ঞেয়ম্।

(৪) তেষান্তু এযাণামপি ক্ষীরং দোষাণাং প্রতি বিশেষমভি সমীক্ষ্য যথাস্বং যথা দোষঞ্চ বমন বিরেচনাস্থাপনানু বাসনানি বিভজ্য কৃতানি প্রশমনায় ভবন্তি।

তাৎপর্য্যার্থ—স্তন্য সম্পৎ এই যে—যে স্তন্যে (দুধের) বর্ণ গন্ধ ও রস এবং স্পর্শ অবিকৃত সেই স্তন্য সম্পদযুক্ত।

তাহার পরীক্ষা—জলপূর্ণ পাত্রে দোহন করিলে সম্পদযুক্ত স্তন্য (দুগ্ধ) জলের সহিত সর্ব্বতোভাবে একীভূত হইয়া যায়। অধিকৃত হেতু ইহা পুষ্টি ও আরোগ্যজনক। ইহার অন্যথা হইলে, জল পাত্রে দুহ্যমান হইয়া (দোহন করিলে) দুগ্ধ জলের সহিত যদি একীভূত না হয় তবে তাহাকে বিকৃত বলিয়া জানিবে। তাহার বিশেষত্ব কথিত হইতেছে,—

(১) স্তন্য (দুগ্ধ) শ্যাম (কৃষ্ণ মিশ্রিত পীত) বা অরুণবর্ণ (রক্তবর্ণ) কষায়ানু রস অপিচ্ছিল, সম্যগ্ লক্ষনীয় গন্ধরহিত, রুক্ষ পাতলা, ফেনিল, লঘু অতৃপ্তিকর, কৃশকর ও বাতরোগজনক হইলে তাহাকে বাত-দূষিত বলিয়া জানিবে।

(২) স্তন্য (দুগ্ধ) কৃষ্ণ, নীল, পীত বা তাম্রবর্ণ, তিক্তরস, কটু ও অম্লানুরস শব দুর্গন্ধী বা রক্তগন্ধী, অতি উষ্ণ এবং পিত্ত-রোগজনক হইলে তাহাকে পিত্ত-দুষ্ট বলিয়া জানিবে।

(৩) স্তন্য অতি শুক্ল, অতি মধুর, লবণানুরস, ঘৃত, তৈল বসা ও মজ্জাগন্ধী, পিচ্ছিল, তন্তুবৎ (সূতার মত) ও জলে নিক্ষেপ করিলে মগ্ন হইলে এবং শ্লেষ্মাবর্দ্ধক হইলে তাহাকে শ্লেষ্মাদূষিত বলিয়া জানিবে।

(৪) স্তন্য বাতাদি দ্বারা দূষিত হইলে স্তন্যদূষক সেই বাতাদি দোষ ত্রয়ের বিশেষ বিশেষ অবস্থা (কোষ্ঠাশ্রয়ত্বাদি দুষ্টি বিশেষ) ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া বমন, বিরেচক, আস্থাপন বা অনুবাসন ইহা-দের মধ্যে যাহা স্তন্য দাত্রীর এবং বাতাদি দোষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য

হইবে, স্তন্য দোষ নিবারণার্থ তাহাই প্রয়োগ করিবে।

চরক সংহিতায় দূষিত স্তন্য সংশোধনের উপায় এই প্রকার কথিত হইয়াছে, যথা—

পানাশন বিধিস্তু দুষ্ট ক্ষীরায়া যব গোধুম শালি ষষ্ঠীক মুদগ হারন্মুক কুলত্থ সুরা সৌবীরক মৈরেয় মেদক লসুন করঞ্জ প্রায়ঃ স্যাৎ ক্ষীর বিশেষাং শ্চাবেক্ষ্যাবেক্ষ্য তত্তদ্বিধানং কার্য্যং স্যাৎ। পাঠা মহৌষধ সুরা দারু মুগ মূর্ব্বা গুড়ূচী বৎসকফল কিরাত তিক্ত কটুক রোহিণী শারিয়া কষায়ানাঞ্চ পানং প্রশস্যতে।

তথানোষাং তিক্ত কষায় কটুক মধুরানাং দ্রব্যানাং প্রয়োগঃ ইতি ক্ষীর বিশোধনাস্যুক্তানি ভবন্তি, ক্ষীরবিকার বিশেষানভিসমীক্ষ্য মাত্রাং কালঞ্চেতি ক্ষীরং বিধানানি।

অর্থাৎ—স্তন্য দূষিত হইলে দূষিত কারক বাতাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যব, গোধুম শালি, (১) ষষ্টিক (ষঠেধান) মুদ্গ (মুগ), হারন্মুক (বড়ছোলা মটর), কুলত্থ (কলাই), সুরা, সৌবীর (কাঞ্জি), মৈরেয় (মদ্যবিশেষ), মেদক (ঘনসুরা), লসুন (রসুন), করঞ্জ (করঞ্জাফল), এই সকল দ্রব্য ভক্ষ্য বলিয়া ব্যবস্থা করিবে। আকনাদি শুঠ, দেবদারু, মুতা (২) মূর্ব্বা (মুবহর) গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কটকী ও অনন্তমূল ইহাদের এবং এই প্রকার অন্যান্য তিক্ত কষায় কটু ও মধুর

(১) শালি ধান্য বিশেষ, অথবা কৃষ্ণ জীরা (কালজীরা)

(২) মূর্ব্বা—ইহার নামান্তর মূর্গা, গোচমুখী, ঘোড়াচক্র, এতদভাবে পিপুলী ব্যবস্থা।

দ্রব্যের ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। স্তন্য বিকৃতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া এবং মাত্রা ও কালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত আকনাদির পান ভোজন ব্যবস্থা করিবে। বিশুদ্ধ স্তন্যের লক্ষণ সুশ্রুতে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে যথা—"স্তন্যমপ্সু পরীক্ষেত—তচ্চেচ্ছীতলং অমলং তনু শঙ্খা বিভাগমপসু ন্যস্তমেকীভাবং গচ্ছত্যফেনিল মতন্তু মন্নোৎপ্লবতে নসীদতিবা তচ্ছুদ্ধমিতি বিদ্যাৎ"—অর্থাৎ স্তন্য (দুগ্ধ) জলে নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করিবে। যদি তাহা শীতল অমল তনু (সূক্ষ্ম) ও শাঙ্খবর্ণ (শুভ্র) হয় এবং জলে নিক্ষেপ করিলে তাহা ভিন্ন না হইয়া (ছড়াইয়া না যাইয়া) একীভাব প্রাপ্ত হয় ফেনিল ও তন্তুযুক্ত (সূতার ন্যায়) না হয় ভাসমান না হয় ও মগ্ন না হয় তবে তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থের মত বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না, অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ মূল গ্রন্থগুলি দেখিলেই এবিষয় বিস্তারিত মত অবগত হইতে পারিবেন।

গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি করার উপায়।

গবাদির দুগ্ধ বৃদ্ধি করার উপায় বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করা এই গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে, তথাপি আনুষঙ্গিক ভাবে কতকগুলি বলা যাইতেছে। এ বিষয়ে গোপালন বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থাদিতে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, সে সমুদয় বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত

করিলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হয় বিবেচনায় তাহা পরিত্যক্ত হইল। প্রয়োজন বোধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে। আহার্য্য পদার্থের সহিত দুগ্ধের সম্বন্ধ বিষয়ক প্রস্তাবে এ বিষয় কিছু কিছু বলা গিয়াছে। এ স্থলে ইংরেজী গ্রন্থের মত গুলি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইল।

"Silage" (সিলেজ অর্থাৎ পোতা ঘাস) (১) গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক, কিন্তু ভাল রকম প্রস্তুত না হইলে, ইহা ব্যবহারে দুগ্ধের গুণ হানি হয়।

যব গম ইত্যাদি শস্য অপক্কাবস্থায় কিম্বা খোসাসমেত এবং খোসা ছাড়ান প্রভৃতি যে কোনও অবস্থায়ই হউক গাভীকে খাইতে দিলে তাহার পুষ্টি ও দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

কপি, শালগম, গাঁজর, পার্স্নিপ, রেপ, মেন্ গোলড, সুইড প্রভৃতি বিলাতী শাক সবজি প্রভৃতি রসাল খাদ্য ব্যবহারে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। গাজর, পার্স্নিপ ও শালগম সেবনে দুগ্ধের উগ্র গন্ধ হয়, অতএব এগুলি গাভীকে অধিক খাইতে দেওয়া উচিত নহে। মদের ছিবড়া (শেষাংশ) দুগ্ধ-বৃদ্ধিকর, কিন্তু ইহা সেবনেও দুগ্ধে দুর্গন্ধ হয়।

নানা প্রকার খোল (খৈল) এবং সিদ্ধ করা শস্য দ্বারা প্রস্তুতীয় খাদ্য গোদুগ্ধের পরিমাণ ও গুণ বৃদ্ধিকারক। মটর এবং বীনের (এক প্রকার বিলাতী সীম্) সার ভাগ অত্যন্ত

(১) পোতা ঘাস অনেক প্রকার, ইহার প্রস্তুত প্রণালী ইংরেজী গ্রন্থাদিতে দ্রষ্টব্য।

অধিক (ইহা প্রায় শতকরা ২০ অংশ) ইহাও দুগ্ধের গুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মাকু (ইহাতে চর্ব্বীর অংশ শতকরা প্রায় ৪'৫ হইতে ৫ অংশ পর্য্যন্ত) খাইলেও দুগ্ধের গুণ এবং পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। তিসি দুগ্ধ বৃদ্ধিকর। তুলার বীজ এবং তালশাসে প্রস্তুত খাদ্য (Palm nut meat) দুগ্ধ ও নবনীত বৃদ্ধিকারক। এগুলি সেবনে নবনীতে সুগন্ধও হয়।

গম, যব প্রভৃতি শস্যের ভূষি ও ভূষা এবং তিসি প্রভৃতি স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত) পদার্থও খোল (খৈল) গাভীর দুগ্ধ-বৃদ্ধিকারক। যে কোনও শস্যের খোলই হউক, তাহা বেশ বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্রিত হওয়া চাই, নতুবা অনিষ্টকারক হয়।

সাধারণ মন্তব্য :—গাভীর খাদ্যাদি হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইলে এবং গাভীকে স্থানান্তরিত করিলে এবং অন্যান্য নানা কারণে তাহার দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং দুগ্ধেরও গুণ হানি হয়। লবণ গাভীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ, ইহাতে তাহার স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দুগ্ধের পরিমাণ ও গুণ বৃদ্ধি হয়। পরিষ্কৃত জল গাভীর দুগ্ধ-বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে, অতএব গাভীকে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। অপরিষ্কৃত জল পানে গাভীর স্বাস্থ্য হানি এবং দুগ্ধের গুণ হীনতা ঘটে, অতএব তাহা করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে।

অধুনা দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক আয়ুর্ব্বেদোক্ত দ্রব্যগুলির বিষয় কথিত হইতেছে :—যদিও এ সমস্ত নারীদুগ্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উক্ত

হইয়াছে, তথাপি ইহাদের কতকগুলি উপযুক্ত মাত্রায় অবস্থা বিবেচনা করতঃ ব্যবহার করাইলে গবাদিরও দুগ্ধ বৃদ্ধি করিতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা।

চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে :—

ক্ষীর জননাতিতু মদ্যানি সীধুবর্জ্জ্যানি, গ্রাম্যানূপৌদকালি চ শাক ধান্য মাংসানি দ্রব মধুরাম্ল ভূয়িষ্টশ্চাহারা ক্ষীরিণ্যশ্চৌষধয়ঃ ক্ষীর পানঞ্চানায়মশ্চ, বীরণ ষষ্ঠী শালিকেক্ষু বালিকা দর্ভ কুশ কাশ গুন্দ্রেৎকট মূল কষায়াণাঞ্চ পানাবিতি ক্ষীরজনান্যুক্তানি অর্থাৎ—সীধু ব্যতীত অন্য সমস্ত মদ্য, গ্রাম্য, আনূপ (জলযুক্ত স্থান) ও জলজ যাবতীয় শাক, ধান্য ও মাংস (গবাদির পক্ষে মাংস নিষিদ্ধ) এবং দ্রব ও মধুরাম্ল রসযুক্ত সমস্ত আহার্য্য পদার্থ, বট ও উডুম্বরাদি (ডুমুর), ক্ষীরিণী ওষধি সকল (বট, অশ্বত্থ, ডুম্বুর, আকন্দ, শশা, সোমলতা প্রভৃতি) দুগ্ধ পান, শ্রমরাহিত্য এবং বেণা (বিন্না), ষষ্টীক ধান্য, শালি (শালিধান্য অথবা কালজিরা), ইক্ষু, বালিকামূল, (খাগড়ামূল ও পত্রাদিও বুঝিতে হইবে), দর্ভ (উলুবন), কুশ, কাশ (কেশেবন), শর (তৃণ বা মুথা), ইৎকট্ (ইক্ড়াবন) ও ইহাদের মূলের ক্বাথ (নারীর পক্ষে) দুগ্ধ বৃদ্ধিকর, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

ভাব প্রকাশে দুগ্ধের অল্পতা হওয়ার কারণ নিম্নলিখিত মত কথিত হইয়াছে যথা :—

অবাৎসল্যাত্তয়াচ্ছোকাৎ ক্রোধাদপ্যপতর্পণাৎ
স্ত্রীণাং স্তন্যং ভবেৎ স্বল্পং গর্ভান্তর বিধারণাৎ ॥

অর্থাৎ সন্তানের প্রতি বাৎসল্যাভাবে, ভয়, শোক, ক্রোধ ও উপবাস হেতু এবং পুনর্ব্বার গর্ভ সঞ্চার হইলে স্ত্রীজাতির স্তন দুগ্ধের অল্পতা ঘটে।

তাহা বৃদ্ধি করার উপায় ভাব প্রকাশে নিম্নলিখিত মত কথিত হইয়াছে :—

"শালি ষষ্ঠিক গোধুমান্ মাংস ক্ষুদ্র ঋষানপি।
কালশাকমলাবুঞ্চ নারিকেলং কশেরুকম্॥
শৃঙ্গাটকং বরীঞ্চাপি বিদারী কন্দমেবচ।
লসুণং দুগ্ধ বৃদ্ধ্যৈঃ স্ত্রী সেবতে সুমনাভবেৎ॥
কলমস্য তন্তুলানাং কলকং যা ক্ষীর পেষিতং পিবতি।
সা ভবতি ভৃশং তরুণী ক্ষীর ভরৈর্নৈব তুঙ্গ কুচযুগলা॥"

কলম ধান্যের বিশেষ লক্ষণ—

"কলম ধান্যবিশেষ স্তস্য লক্ষণ মাহ ;—
কলম কলি বিখ্যাতো জায়তে স বৃহদ্ভ্রূদে।
কাশ্মীর দেশেএ বোক্তা মহাতণ্ডুল সংজ্ঞকঃ॥
বিদারি কন্দস্য রসং পিবেৎ স্তন্যস্য বৃদ্ধায়ে।
তচ্চূর্ণ তস্য বৃদ্ধ্যর্থং পিবেদ্বা ক্ষীর সংযুতম্॥"

অর্থাৎ—স্তন্য বৃদ্ধির উপায় কথিত হইতেছে—শালি (শালি ধান্য), ষষ্ঠিক ধান্য (ষটেধান), গোধুম (গম), মাংস ও ক্ষুদ্র মৎস্য (গবাদির পক্ষে মৎস্য মাংসাদি নিষিদ্ধ), কাল শাক, অলাবু (লাউ), নারিকেল, কেশুর, পানিফল, পতাবরী (শতমুলী)

ভুঁই কুমড়া ও রসুন এই সকল ভক্ষণ করিলে স্ত্রীদিগের স্তন্য অতিশয় বৃদ্ধি পায়। কলম ধান্যের চাল চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে স্ত্রী তরুণী হয় এবং দুগ্ধভরে তাহার স্তনযুগল উচ্চ হয় (অর্থাৎ দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়)।

কলম ধান্যের লক্ষণ ;—কলম ধান্য "কলি" নামে বিখ্যাত ; ইহা বৃহৎ হ্রদে (জলাশয়ে অর্থাৎ বিলে) জন্মিয়া থাকে। কাশ্মীর দেশে ইহা "মহা তণ্ডুল" নামে কথিত হইয়া থাকে। ভুঁই কুমড়া চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

সুশ্রুত সংহিতায় কথিত হইয়াছে ;—

"ক্রোধ শোকা বাৎসল্যাদিভিশ্চ স্ত্রিয়াঃ স্তন্য নাশো ভবতি অথাস্যাঃ ক্ষীর জননার্থং সৌমনস্য মুৎপাদ্য যব গোধুম শালি ষষ্ঠিক মাংস রস সুরা সৌবীরক পিণ্যাক অশুন, মৎস্য কশেরুক, শৃঙ্গাটক বিম বিদারি কন্দ মধুক শতাবরী নালিকালাবু কালশাক— প্রভৃতীনি বিধত্যাৎ—।

অর্থাৎ—ক্রোধ শোক ও বাৎসল্যাভাব হেতু স্ত্রীদিগের স্তন্য নাশ হয় (দুগ্ধের অল্পতা হয়) ; তাহা বৃদ্ধি করার জন্য স্ত্রীদিগের মনের স্বাস্থ্য উৎপাদন করিয়া, তাহাদিগকে যব, গোধুম (গম), শালি ধান্য, ষষ্ঠিক ধান্য মাংস রস (গবাদির পক্ষে নিষিদ্ধ), সুরা, সৌবীরক (কাঞ্জি), পিণ্যাক (তিলপিষ্ঠ), রসুন, মৎস্য, (গবাদির পক্ষে অব্যবস্থা) কেশুর, শৃঙ্গাটক (পানিফল), নালিকা (মামলা কাবিশাক), অলাবু কালশাক প্রভৃতি ভক্ষণ করাইবে।

অগ্নিপুরাণে কথিত হইয়াছে :—

"অশ্বগন্ধাতিলৈঃ শুক্লং তেন গৌ ক্ষীরিণী ভবেৎ।"

অর্থাৎ—অশ্বগন্ধা ও তিলের সহিত নবনীত (মাখন) মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করাইলে গাভীসকল দুগ্ধবতী হয়।

"স মসূর শালি বীজং পীতং তক্রেণ ঘর্ষিতং।

ক্ষীরং গো মহিষ স্যৈব গো পুংশ্চ হিতং ভবেৎ॥

অর্থাৎ—মসূরের (মসূরির দাইল) সহিত শালি বীজ (কাল-জিরা) মিশ্রিত করিয়া দধি বা ঘোলের সহিত পান করাইলে গো ও মহিষের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় এবং ষণ্ডাদিরও উপকার হয়।

গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি করার আরও কয়েকটী উপায় কথিত হই-তেছে। ভাতের ফেন (মাড়) যবচূর্ণ, কঁচি ঘাস গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধিকারক। চা'ল অলাবু (লাউ) একত্র সিদ্ধ করিয়া গাভীকে খাইতে দিলে তাহার দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করান উচিত নহে। অর্দ্ধসের মাষ কলাই, অর্দ্ধসের ভাতের মাড়ী, এক ছটাক লবণ এক পোয়া লালী (মাত্‌গুড়) এবং এক তোলা পিপুল চূর্ণ একত্র মিলাইয়া খাইতে দিলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। গাভীর অবস্থা ও বয়স ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপ-রোক্ত দ্রব্যাদির মাত্রার ইতর বিশেষ করিতে হইবে। বাঁশের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে অর্দ্ধ ছটাক জোয়ান্ (জবানী) চূর্ণ, এবং অর্দ্ধ পোয়া আঁকের গুড় মিশাইয়া খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। ২ | ৪টী এরণ্ড পত্র (এরণ্ড পাতা) সিদ্ধ করিয়া

ঈষদুষ্ণ থাকিতে সে গুলি গাভীর ওলানে একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা জড়াইয়া রাখিলে এবং অল্পক্ষণ পরে সে গুলি ফেলিয়া দিয়া গাভীকে দোহন করিলে অধিক দুগ্ধ দিয়া থাকে।

বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে দুগ্ধাভাবের কারণ ও তাহার বিষম পরিণাম।

যে ভারতবর্ষ এক সময়ে লক্ষ্মীর লীলা-নিকেতন বলিয়া ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিল এবং যে দেশে দুগ্ধ ও তজ্জাত নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী সহজলভ্য ও অপর্য্যাপ্ত ছিল, সেখানে অধুনা দুগ্ধাদি এত দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইল কেন? অনুধাবন করিয়া দেখিলে নানা কারণে গোজাতির লোপাপত্তি ও অবনতিই এই শোচনীয় অবস্থার একমাত্র কারণ, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে গবাদির কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহা পশ্চাল্লিখিত বিবরণ হইতে সবিশেষ উপলব্ধি হইবে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে অষ্ট্রেলিয়া দেশে ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত ১১টী গো-মহিষ, মেষ, ছাগ প্রভৃতি দুগ্ধদাত্রী প্রাণী বর্ত্তমান ছিল এবং সেই বৎসরে ভারতবর্ষে—এই আসমুদ্র হিমাচল মহাদেশে ৯ কোটী ৭৫ লক্ষ ৬৫টী মাত্র উক্তবিধ পশ্বাদি বিদ্যমান ছিল,

অথচ অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতের আয়তন তুলনা করিলে, এখানে ২৬২ কোটি ৮০ লক্ষ গবাদি বর্ত্তমান থাকা উচিত ছিল। নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলে অবস্থা কতদূর শোচনীয় হইয়াছে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

এখন একবার ইংলণ্ডের ও স্কটলণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক; সে সকল স্থানে দেখিতে পাইবেন, কিছুকাল পূর্ব্বে ২,২৫০,০০০টী গাভী, বৎস ও বকন প্রভৃতি বর্ত্তমান ছিল এবং তখন বাৎসরিক দুগ্ধের পরিমাণ ১০০০,০০০,০০০ (gallon)। এক গ্যালন ৮০ তোলার সেরের প্রায় তিন সের তুল্য) এই অপরিমিত দুগ্ধ তত্রত্য বালক বালিকা এবং অন্যান্য অধিবাসীবর্গের ব্যবহারে এবং নবনীত ও পনীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যয়িত হইয়াছিল।

মেঃ মর্টনের গণনানুসারে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ডে (United Kingdom) ৩,৬৮২,৩১৭টী দুগ্ধদাতৃ গাভী এবং বৎসাদি বর্ত্তমান ছিল ও তখন বার্ষিক দুগ্ধের পরিমাণ ১৬২০,২১৯,৪৮০ গ্যালন ছিল; এখন ভাবিয়া দেখুন ১৯০৪ খৃঃ অব্দে সেখানে গবাদি ও দুগ্ধের পরিমাণ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে; যদি বলেন যে তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ অনাবশ্যক, কেননা ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এখন লক্ষ্মী ও সরস্বতী চির প্রচলিত কলহ পরিত্যাগ করতঃ প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছেন, অতএব সেখানে অবনতি কল্পনাতীত বা অসম্ভব।

এখন একবার দেখা যাউক আমেরিকার কি অবস্থা। সেখানেও দেখিতে পাইবে, বিগত ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে কেবল মাত্র United Stateএ (ইউনাইটেড ষ্টেটে) ১৫,০০০,০০০টী গো-বৎস প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। সেখানে বাৎসরিক দুগ্ধের পরিমাণ ১৬২০,২১৯,৪৮০ গ্যালন ছিল। প্রত্যেক গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ ৪০০ গ্যালন ধরিয়া এই হিসাব করা গেল। এখন সমগ্র আমেরিকা মহাদেশে গাভী এবং দুগ্ধের পরিমাণ কত হয় ইহা বর্ণনীয় নহে, অনুমেয় মাত্র। আমরা গো-রক্ষক জাতি বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ কিন্তু ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকান্ গোভক্ষক জাতি, তথাপি তাঁহারা গোরক্ষা ও তাহাদের উন্নতি কল্পে যাদৃশ মনোযোগী এবং যত্নশীল, আমরা তাহার শতাংশের একাংশও নহি; ইহা আমাদের পক্ষে লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। আমাদের মনে হয় ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় দৈনিক গোদুগ্ধে একটা ক্ষুদ্র জলাশয় পূর্ণ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যদেব! তুমি না "গো ব্রাহ্মণ হিতায়" ছিলে, এখন কি ভারতের পক্ষে "তত্তদ্বধায়" হইয়াছ?

আমাদের দেশে গোজাতির ক্রমে বিলুপ্তির সহিত দুগ্ধের অভাবজনিত কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কীদৃশ ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখা যাউক। বিগত ১৯০১ সনের সেন্‌সাসে (আদম সুমারীতে) জানা যায় যে, কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অধীনে প্রতি সহস্রে গড়ে ৩৩০ জন নিরীহ শিশু অকালে ভব-লীলা সম্বরণ করিয়াছে এবং গত ১০ বৎসরে প্রতি সহস্রে গড়ে

৪০০ জন অপোগণ্ড বালক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। চিকিৎসকগণ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে Infant Lever (শৈশব যকৃতের পীড়া) এই অকাল মৃত্যুর কারণ এবং অপরিষ্কৃত জলমিশ্রিত কৃত্রিম গোদুগ্ধ পানই এতাদৃশ পীড়ার মূল। যদি একমাত্র কলিকাতা মহানগরীতেই এই অবস্থা হইয়া থাকে, তবে ভারতের অন্যান্য নগরীতে কি অবস্থা হইয়াছে তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বড় বড় সহরেই এতাদৃশ মৃত্যু সংখ্যা অধিক, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু আজকাল পল্লীগ্রাম সমূহেও যে প্রকার দুগ্ধাভাব ঘটিতেছে তাহাতে অচিরেই সে সকল স্থানেও নগরাদির ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হইবে, অতএব সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দেশহিতৈষী ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় গোজাতির প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ তাহাদের রক্ষা ও উন্নতির উপায় বিধান না করিলে আর রক্ষা নাই; তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা ব্যতীত গোবংশ ভারতবক্ষ হইতে চিরতরে লুপ্ত হইবে এবং তৎসহ আমরাও বিলয় দশা প্রাপ্ত হইব। এ বিষয় সদাশয় গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন, ইহা কতকটা মঙ্গলের চিহ্ন বটে। সত্য বটে, আর্য্য মহর্ষিগণ গোদুগ্ধ ও অন্যান্য গব্য পদার্থের মহৎ উপকারিতা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই এই পশুর (গোজাতির) রক্ষা ও উন্নতি কামনায় নানাবিধ-ব্যবস্থা শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা হেলায় সে গুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ গোবংশের

ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি এবং আমরাও ক্রমে উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইতেছি। ইয়ুরোপীয়গণ পক্ষান্তরে ইহার উন্নতি পক্ষে অপরিসীম যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিতেছেন। আমরা তাঁহাদের অসদ্ দৃষ্টান্তের অযথা অনুকরণ করিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের একাগ্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুসরণ করিতেছি না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

গো-দুগ্ধ ও তজ্জাত পদার্থ নিচয়ের অপরিসীম উপাদেয়তা এবং উপকারীতা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই আমাদের শাস্ত্রকার ঋষিগণ প্রত্যেক মাঙ্গলিক ব্যাপারে ও শ্রাদ্ধাদিতে গব্য নানা প্রকার পদার্থের ভূরি ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং গোবৎসের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া ব্রাহ্মণকে গো দোহন করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়া গিয়াছেন; ব্রাহ্মণের পক্ষে গো বিক্রয়েও নিষিদ্ধ হইয়াছে যথা;—

"গবাং বিক্রয়কারীচ গবি রোমানি যানি চ।
তাবদ্বর্ষ সহস্রানি গবাং গোষ্ঠে কৃমির্ভবেৎ॥"

অর্থাৎ—গোবিক্রয়কারী (ব্রাহ্মণ) গাভীর গাত্রে যত লোম আছে, তত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত গো-গোষ্ঠে কৃমি হইয়া বাস করে।

"গাং দুহন্তি চ যে বিপ্রাঃ পাপিষ্ঠাঃ ক্ষীরলিপ্সয়া।
দধি বিষ্ঠা পয়ো মূত্রঃ মত্ত তুল্যং ঘৃতং ভবেৎ॥

সদ্যঃ পতিত লৌহেন লাক্ষয়া লবণেন চ
ত্র্যহেন শূদ্রী ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়াৎ ॥”

অর্থাৎ—যে সকল পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দুগ্ধ লিপ্সায় গো দোহন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই দুগ্ধজাত দধি বিষ্ঠাতুল্য, দুগ্ধ মূত্র সম এবং ঘৃত মদ্য তুল্য হয়। ব্রাহ্মণ লৌহ বিক্রয়ে লাক্ষা ও লবণ বিক্রয়ে সদ্যঃ পতিত হন এবং দুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা তিন দিবসে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

দুগ্ধাদি বিক্রয় করিলে ক্রমশঃ ব্যবসায় লাভবান হওয়ার আশায় বৎসের প্রতি নির্দ্দয়তা হইবে এবং গো বিক্রয়ের প্রশ্রয় দিলে তাহার প্রতিও নির্দ্দয়তা হইবে এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ গো ও দুগ্ধ বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এখন গো এবং দুগ্ধ বিক্রয় ব্যতীতও ব্রাহ্মণ সন্তান ততোধিক গুরুতর নিষিদ্ধ কার্য্যও অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতেছেন, ইহা কতদূর সঙ্গত একটু চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

প্রসঙ্গাধীন ইহাও বক্তব্য এই ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং বলদই কৃষি কার্য্যের প্রধান সহায়, অতএব গোজাতির অভাবে কৃষকের কত অসুবিধা ও অনিষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না। কৃষকের অনিষ্টে ভারতবর্ষের অমঙ্গল। ভারতবর্ষে শতকরা ৬৯.৯২ জন কৃষিজীবি একথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

গবাদির বিলোপের প্রধান প্রধান কয়েকটী কারণ নিম্নে কথিত হইতেছে যথা ;—

(১) গোজাতির প্রতি অযত্ন ও তাহার অপালন।

(২) গোচারণ ভূমির অভাব।

(৩) গো-মড়ক ও অন্যান্য সাংক্রামিক পীড়াজনিত অকাল মৃত্যু।

(৪) যদৃচ্ছা গোবধ।

(৫) লাভের আশায় অতিরিক্ত গো দোহন এবং তজ্জনিত বৎসের দুর্ব্বলতা এবং অকাল মৃত্যু।

(৬) চর্ম্মকার ও অন্যান্য চর্ম্মব্যবসায়ীগণ দ্বারা বিষ প্রযোগে গোবধ।

উপরোক্ত কারণগুলির মধ্যে কতকগুলির প্রতীকার আমাদের আয়ত্বাধীন এবং কতকগুলির নহে; এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বিধায় পরিত্যক্ত হইল। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে কেবল মাত্র গো মড়কে ভারতবর্ষে প্রতি বর্ষে গড়ে প্রায় ৯০০০০০০০৲ টাকা ক্ষতি হইতেছে। অন্যান্য কারণে গবাদির মৃত্যু সংখ্যা গণনা করিলে ক্ষতির পরিমাণ কত হয় তাহা অনুমেয়।

দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ করুণা-পরবশ ও যত্নশীল হইয়া গো-জাতির রক্ষা ও উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে অগ্রসর হইলেই দেশে দুগ্ধাদির প্রাচুর্য্য হইবে এবং আমাদেরও বল বীর্য্য উৎসাহ ও আয়ুবৃদ্ধি হওয়ার পথ উন্মুক্ত হইবে, নতুবা আমাদের অধঃপাতের গতি কিছুতেই অবরুদ্ধ হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য।

উপসংহার।

দুগ্ধ বিষয়ে প্রায় সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলা হইল; এ বিষয় আরও বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান কালে অস্মদ্দেশে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে; সেই পন্থা প্রদর্শনই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অভি-প্রেত। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, দুগ্ধজাত নবনীত, দধি, সর এবং তত্তজ্জাত ঘৃত, তক্র, ছানা প্রভৃতির বিষয় এ গ্রন্থে কিছুই বলা বলা হয় নাই; এই সমস্ত পৃথক পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করা কৃতবিদ্য-গণের কর্ত্তব্য। দুগ্ধাদি ও শর্করা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি সংযোগে কত প্রকার উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত হইতে পারে তাহা বলা যায় না। এ সম্বন্ধেও গ্রন্থ প্রচারিত হওয়া উচিত। সুখের বিষয় অধুনা কেহ কেহ এতাদৃশ গ্রন্থাদি প্রকাশিত করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ভরসা আছে অচিরে এ সমস্ত বিষয় বিশদ ও বিস্তৃত গ্রন্থাদি প্রচারিত হইবে এবং তৎসহ বঙ্গভাষার কলেবর পুষ্টি এবং শ্রী বৃদ্ধি হইবে।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কোনও প্রকার ত্রুটী বা ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইলে তৎ সমস্তই আমার এবং কোনও গুণ থাকিলে তাহা সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন এবং সর্ব্ব কর্ম্মফলদাতা ভগবানের কৃপাবিন্দু প্রসাদাৎ—বিশুরেনালম্।